প্রশ্ন : ভারতের দলীয় ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ কর ।

উত্তর : ভরতের গনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলগুলি যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই । ভরতীয় শাসন ব্যবস্থায় অপরিহার্য্য অঙ্গ হিসাবে রজনৈতিক দলগুলি সুপ্রতিষ্ঠিত । ভারতের দলীয় ব্যবস্থার মুখ্য বৈশিষ্ট্যগুলি হল -

১) প্রাধান্যকারী দলীয় ব্যবস্থা : ভারতে বহুদলীয় ব্যবস্থা প্রচলিত থাকলেও এবং নির্বাচনে অনেকগুলি দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও নির্বাচনের ইতিহাসে দেখা গেছে যে কংগ্রেস দল দীর্ঘদিন কেন্দ্রে ও রাজ্যে একক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করেছিল । মধ্যিখানে কংগ্রেস দলের প্রাধান্য কিছুটা হ্রাস পেলেও পরে আবার কংগ্রেসের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয় । তবে বর্তমানে বিজেপি দলের উত্থান কংগ্রেসের প্রাধান্য অনেকটাই ক্ষুন্ন করেছে ।

২) দলীয় কাঠামোর এককেন্দ্রিক প্রবনতা : ভরতের রাষ্ট্র কাঠামো যুক্তরাষ্ট্রীয় হলেও দলীয় কাঠামো কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রীয় নয় । কেন্দ্রীয় নির্দেশে দলের রাজ্য ও আঞ্চলিক নেতৃত্ব পরিচালিত হয় । যেমন কংগ্রেসের হাইকমানড যা বলে দলের প্রতিটি স্তর তা মেনে চলে। তেমনি সি.পি.এমের পলিটব্যুরো যা বলে দলের প্রতিটি স্তর তা মেনে চলে। জনতা, বিজেপি প্রভৃতির ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য ।

৩) মতাদর্শগত ভিন্নতা : ভারতে রাজনৈতিক দলগুলির মতাদর্শগত ভিন্নতা আছে । যেমন, কংগ্রেস দল গনতান্ত্রীক সমাজতন্ত্র তথা গান্ধীবাদে বিশ্বাস করে । কমিউনিস্ট দলগুলি মার্কসীয় সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করে । বিজেপি জাতীয়তাবাদ,পুঁজিবাদ এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদে বিশ্বাস করে ।

৪) ব্যক্তিকেন্দ্রীক রাজনৈতিক দল : ভরতের দলীয় ব্যবস্থার একটি বৈশিষ্ঠ্য হল ব্যক্তি কেন্দ্রিক রাজনৈতিক দলের উদ্ভব । এপ্রসঙ্গে ইন্দিরা কংগ্রেস, বিজু জনতা দল প্রভৃতির কথা উল্লেখ করা যায় ।

৫) নেতা বা নেত্রী কেন্দ্রীক রাজনৈতিক দল :ভারতের দলীয় ব্যবস্থায় দেখা যায় বিশিষ্ট কোন নেতা নেত্রীকে কেন্দ্র করে দল গড়ে উঠতে এবং পরিচালিত হতে। যেমন, কংগ্রেসের নেহরু বা নেহরু পরিবার, সমাজতন্ত্রী দলে জয় প্রকাশ নারায়ন, রাষ্ট্রীয় জনতা দলের লালু প্রসাদ যাদব, এ.আই.ডি.এম..কে-র জয়ললিতা, ডি.এম..কে-র করুনানিধি, জাতীয়তাবাদী কংগ্রেসের শারদ পাওয়ার, তৃনমূল কংগ্রেসের মমতা বন্দ্যোবান্ধ্যায় প্রভৃতি ।

৬) সাম্প্রদায়ীক দলের উপস্থিতি : সংবিধানে ভারতকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলা হলেও ধর্মের ভিত্তিতে বেশ কিছু রাজনৈতিক দল গড়ে উঠতে দেখা যায় । যেমন, মুসলীম লীগ, ভারতীয় জনসংঘ, রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ প্রভৃতি ।

৭) আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলের উপস্থিতি : ভারতে অনেকগুলি আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় । এগুলি সাধারনতঃ আঞ্চলিক উন্নয়ন ও দাবী-দাওয়া নিয়ে গড়ে উঠেছে । উল্লখযোগ্য আঞ্চলিক দলগুলি হল এ.আই.ডি.এম..কে, ডি.এম..কে, বি.এস.পি, তেলেগু দেশম, আকালী দল, ঝাড়খন্ড মুক্তি মোর্চা ,অসম গন পরিষদ প্রভৃতি ।

৮) ভাষা ভিত্তিক রাজনৈতিক দল : ভাষাকে কেন্দ্র করেও অনেকগুলি রাজনৈতিক দলের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় । এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল -ড.এম..কে, ঝাড়খন্ড মুক্তি মোর্চা, তেলেঙ্গানা প্রজা সমিতি, গোর্খা লীগ প্রভৃতি ।

৯) দলত্যাগ ও দুর্নীতি : ভারতীয় রাজনীতিতে দলত্যাগ একটি ব্যাধি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত । ১৯৬৭ সালে এই ব্যাধি [প্রকট আকার ধারন করে । এইজন্য ১৯৮৫ সালে দলত্যাগ বিরোধী আইন পাশ করা হয় । যার ফলে এই আয়ারাম-গায়ারাম সংস্কৃতি কিছুটা হলেও নিসন হয়েছে ।

১০) কোয়ালিশন সরকার গঠনের প্রবনতা : ১৯৬৭ সালের পর থেকে ভারতীয় রাজনীতিতে কোয়ালিশন সরকার গঠনের প্রবনতা পরিলক্ষিত হয় । বর্তমানে নির্বাচনী প্রতিদন্ধিতা হচ্ছে জোট ভিত্তিক । বর্তমানে তিনটি প্রধান জোট হল কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন U.P.A, বিজেপি নেতৃত্বাধীন N.D.A, এবং বাম দলগুলির Left Alliance প্রভৃতি ।

প্রশ্ন: রাজনৈতিক তত্ত্ব কি গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছে ? যুক্তি সহ আলোচনা কর ।

অথবা

রাজনৈতিক তত্ত্বের কি অবসান ঘটেছে ? যুক্তি সহ আলোচনা কর ।

উত্তর: রাজনৈতিক তত্ত্ব কি গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছে কি না এ বিষয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা দ্বিধাবিভক্ত । অনেকা মনে করেন যে রাজনৈতিক তত্ত্বের আজ আর কোন গুরুত্ব নেই এবং রাজনৈতিক তত্ত্বের কি অবসান ঘটেছে । আবার অন্যদিকে অনেকা মনে করেন যে রাজনৈতিক তত্ত্বের গুরুত্ব অতীতে যেমন ছিল তেমনি আজও অছে । রাজনৈতিক তত্ত্বের কি অবসান ঘটতে পারে না ।তাদের মতে রাজনৈতিক তত্ত্ব চর্চায় কিছুকাল ভাটা চললেও বর্তমানে রাজনৈতিক তত্ত্বের পুন:রুত্থান ঘটেছে ।

রাজনৈতিক তত্ত্বের কি অবসান ঘটেছে : রাজনৈতিক তত্ত্বের গুরুত্ব হ্রাসের কথা যারা বলেছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন **ডেভিড ইস্টন** এবং **আলফ্রেড কোব্যান** । ডেভিড ইস্টনের মতে, বর্তমানে রাজনৈতিক ঘটনার বিশ্লেষনে রাজনৈতিক তত্ত্বের কোন অবদান নেই । ইস্টনের মতে, প্লেটো থেকে শুরু করে হেগেল এবং মার্কস পর্যন্ত রাষ্ট্রনৈতিক দার্শনিকরা যে সব তত্ত্ব রচনা করেছিলেন সেগুলির লক্ষ ছিল সমসাময়িক রাজনৈতিক ঘটন্য ব্যখ্যা এবং সামাজিক ক্ষেত্রে তার ভালোমন্দ বিচার করা । কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে বর্তমান ঘটনাকে বিশ্লেষণ করে নতুণ কোন মুল্যমান সংক্রান্ত তত্ত্ব আর রচিত হচ্ছে না । বর্তমান রাজনৈতিক তত্ত্ব শুধু বিষয়কে নিয়েই আলোচনা করে । সমসাময়িক রাজনৈতিক ঘটনাকে ব্যখ্যা করে রাজনীতি ও রাজনৈতিক পরিবর্তনকে ব্যখ্যা করার কোন উৎসাহ দেখা যায় না । ইস্টনের মতে এর প্রধান কারন হল ইতিহাস সর্বস্বতা । অর্থাৎ রাজনৈতিক তত্ত্বের আলোচনাকে ইতিহাসমুখী করার প্রবণতা ।

আলফ্রেড কোব্যানও রাজনৈতিক তত্ত্বের গুরুত্ব হ্রাস পেয়েছে বলে মনে করেন । তাঁর মতে এই গুরুত্ব হ্রাসের কারন হল ---

১) বিগত আরাই হাজার বছর রাজনৈতিক তত্ত্ব রচনার মুলে ছিল বাস্তব প্রয়োজনের তাগিদ । বর্তমানে এই তাগিদটি নেই বলে কোন গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক তত্ত্ব রচিত হচ্ছে না ।

২) ন্যায়-নীতি বা মূল্যবোধ রাজনৈতিক ক্ষমতাকে প্রভাবিত করতে পারে । এই ধারনায় মানুষের আর আস্থা নেই ।

৩) বর্তমানে প্রধানত ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক - এই ধারনার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । বৈজ্ঞানিক গবেষনায় মুল্যমান নিরপেক্ষ আলোচনার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয় । অন্যদিকে রাজনৈতিক তত্ত্বের আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে ইতিহাস ।

এছাড়া **ল্যাসলেট, প্যাট্রিজ** প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগন মনে করেন যে রাজনৈতিক তত্ত্বের অবসান ঘটেছে । ল্যাসলেট মন্তব্য করেন যে রাজনৈতিক তত্ত্বের ঐতিহ্য এখন বিলুপ্ত প্রায় ।এবং রাজনৈতিক দর্শন এখন মৃত । প্যাট্রিজের মতে রাজনৈতিক তত্ত্বের বর্তমানে অবসান ঘটেছে এবং এর জন্য তিনি যুক্তিবাদী দৃষ্টবাদের প্রভাবকে দায়ী করেছেন ।

রাজনৈতিক তত্ত্বের কি অবসান ঘটেনি : বিংশ শতাব্দীতে অভিজ্ঞতাবাদী বিশ্লেষন ধারা প্রভাব বিস্তার করায় রাজনৈতিক তত্ত্বের গুরুত্ব অনেকটাই হ্রাস পায় তা অনস্বীকার্য । তবে রাজনৈতিক তত্ত্বের কি অবসান ঘটেছে একথআ বলা যায় না । কেননা বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকে উত্তর আচরনবাদী দৃষ্টিভঙ্গীতে অভিজ্ঞতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর সাথে মুল্যবোধযুক্ত দৃষ্টিভঙ্গীকেও যুক্ত করার প্রবনতা ব্যাপক ভাবে লঙ্য করা যায় এবং সাথে সাথে রাজনৈতিক তত্ত্বও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে ।

রাজনৈতিক তত্ত্বের কি অবসান ঘটেনি এই মতের সমর্থনে যারা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন **জার্মিনো, ওয়েকেশট, স্ট্রাউস, আরেন্দ** প্রমুখ । এরা সকলেই মনে করেন যে রাজনৈতিক তত্ত্বের পূনরায় অভ্যুত্থান ঘটেছে । বর্তমানের এই রাজনৈতিক তত্ত্ব একেবারেই নতূন নয় । এটি পরিশীলিত রাজনৈতিক তত্ত্ব । সাবেকি রাজনৈতিক তত্ত্ব থেকেই অনুপ্রেরণা পেয়েছে এই তত্ত্ব । এটা অনস্বীকার্য

যে গবেষণা যতই অভিজ্ঞতাভিত্তিক হোক না কেন তা কখনই উদ্দেশ্যহীন হয় না । আবার মূল্যায়নে যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠার জন্য তত্ত্বের প্রয়োজন হয় । সুতরাং মূল্যমান বর্জিত আলোচনা যে অসমধব এখন তা স্বীকৃত হয়েছে ।

রাজনৈতিক তত্ত্বের পূন:রুত্থানে নয়া উদারবাদী তাত্ত্বিকদের অবদানও কম নয় । হায়েক, নজিক। মিল্টন, রল্‌স্‌, বার্লিন প্রমুখ নয়া উদারনীতিবাদী তাত্ত্বিকদের তত্ত্বে সামাজিক ন্যায়, গনতান্ত্রিক তত্ত্ব ও বহুত্ববাদ, নারীবাদ, উপযোগীতাবাদ, সমধোগতন্ত্রবাদ প্রভৃতি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে ।

উপরিউকত আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে বর্তমান দিনে রাজনৈতিক তত্ত্বের অবসান ঘটেছে বলে যে মন্তব্যটি করা হয় তা সর্বাংশে সত্য নয় । গত শতকের ষাটের দশকের শেষদিক থেকে যে আচরনবাদিত্ত আন্দোলন শুরু হয় তা পূর্বের মুল্যবোধযুকত রাজনৈতিক তত্ত্বের পুনরায় আবির্ভাব ঘটিয়েছে এবং সেই সঙ্গে রাজনৈতিক তত্ত্বের অবনমন সম্পর্কিত বিতর্কটিরও অবসান ঘটিয়েছে ।

C-11

5th Semester

প্রশ্ন : প্রশাসনের যে কোন দুটি নীতি উল্লেখ কর ।

উত্তর : ১) নির্দিষ্ট কিছু লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরনের জন্য নির্দেশ দান করা, সমন্বয় সাধন করা ও বহু মানুষকে নিয়ন্ত্রন করা ।

২) আইন বিভাগের গৃহিত আইনগুলিকে বাস্তবায়িত করা ।

প্রশ্ন : সরকারী প্রশাসন বলতে কি বোঝ ?

উত্তর : সরকারী প্রশাসন বা জনপ্রশাসন বলতে সেই প্রশাসনকে বোঝায় যা সরকারের সবধরনের কাজকর্ম এবং কাজকর্ম সম্পাদনের বিভিন্ন পদ্ধতির পর্যালোচনা করে ।

প্রশ্ন : বে-সরকারী প্রশাসন বলতে কি বোঝ ?

উত্তর : ব্যাক্তিগত বা গোষ্ঠিগত স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত যে কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের পরিচালন কার্য যখন একজন ব্যাক্তি বা কয়েকজন ব্যাক্তিকে নিয়ে গঠিত একটি পরিচালকবর্গ দ্বারা পরিচালিত হয় তখন তাকে ব্যাক্তিগত বা বেসরকারী প্রশাসন বলে ।

প্রশ্ন : জনপ্রশাসনে কেন্দ্রিকরন বলতে কি বোঝ ?

উত্তর : প্রশাসনিক ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব একটি সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের হাতে কেন্দ্রিভূত থাকে এবং সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ প্রশাসনের উপর সর্বব্যাপী নিয়ন্ত্রন কায়েম রাখে তখন তাকে কেন্দ্রিকরন বলা হয় ।

প্রশ্ন : জনপ্রশাসনে বিকেন্দ্রিকরন বলতে কি বোঝ ?

উত্তর : যখন প্রশাসনিক ক্ষমতা ও কর্তৃত্বকে কোন একটি বিশেষ কর্তৃপক্ষের হাতে কেন্দ্রিভূত না রেখে প্রশাসনের সর্বনিম্ন স্তর পর্যন্ত ছড়িয়ে দেওয়ে হয় তখন তাকে তাকে বিকেন্দ্রিকরন বলা হয় । কেন্দ্রিকরনের ফলে প্রশাসনের সর্বনিম্ন স্তরে অবস্থিত ইউনিটগুলি স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহন রুপায়নের ব্যাবস্থা করতে পারে ।

প্রশ্ন : POSDCORB- এর পূর্নাঙ্গ রুপটি লিখ ।

উত্তর : P-Planning

O - Organization
S - Staffing
D - Directing
Co - Co-ordinating
R - Reporting
B - Budgeting

প্রশ্ন : ``General and Industrial Management`` ও "Administrative Behaviour``-গ্রন্থদুটির প্রনেতাদের নাম লিখ ।

উত্তর : হেনরী ফেয়ল এবং রবার্ট সাইমন ।

প্রশ্ন : ক্রমোচ্চ স্তরবিন্যাস বলতে কি বোঝ ?

উত্তর : ক্রমোচ্চ স্তরবিন্যাস হল উপর থেকে নীচ পর্যন্ত উর্দ্ধতন ও অধস্তনদের মধ্যে পরস্পর সংযুক্ত হওয়া । এ ক্ষেত্রে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ অধস্তনদের উপর আদেশ জারী করতে পারে এবং অধস্তনরা উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের আদেশ মান্য করতে বাধ্য থাকে । সামরিক প্রশাসনে ক্রমোচ্চ স্তরবিন্যাসের আদর্শ রুপটি দেখতে পাওয়া যায় ।

প্রশ্ন : ক্রমোচ্চ স্তরবিন্যাস নীতির যে কোন দুটি সুবিধা উল্লেখ কর ।

উত্তর : ১) সংগঠনের কোন পদে এবং কোন দায়িত্বে কে আছেন সে ব্যাপারে প্রত্যেকের সুস্পষ্ট ধারনা থাকে ।

২) এই পদ্ধতিতে প্রশাসনিক জটিলতা পরিহার করে যে কোন বিশেষ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অধস্তন কেন্দ্র সিদ্ধান্ত গ্রহন করতে পারে ।

প্রশ্ন : আদেশের ঐক্য বলতে কি বোঝ ?

উত্তর : Henry Feyol -এর মতে আদেশের ঐক্য হল ‘‘an employee should receive order from one superior only ." অর্থাৎ একজন কর্মী শুধু একজন উর্দ্ধতন প্রশাসকের কাছ থেকেই আদেশ বা নির্দেশ পাবেন ।একজন অধস্তন ব্যাক্তির একজনই উপলওয়ালা থাকবেন ।

প্রশ্ন : নব জনপ্রশাসন বলতে কি বোঝ ?

উত্তর : সাতের দশকের শুরু থেকে জনপ্রশাসন সম্পর্কে নবীন গবেষকরা যে নতুন চিন্তার প্রবর্তন করেন নায়াগ্রো ও নায়াগ্রো তাকে নব জনপ্রশাসন বলেছেন ।নবাগতরা বলতে চেয়েছেন যে নয়া জনপ্রশাসনের লক্ষ হবে সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা । এবং সরকারী কর্মচারীগনের উচিত প্রশাসন যন্ত্রকে সেইভাবে পরিচালিত করা ।

প্রশ্ন : জনপ্রশাসন ও বে-সরকারী প্রশাসনের মধ্যে দুটি পার্থক্য উল্লেখ কর ।

উত্তর : ১) জনপ্রশাসনের উদ্দেশ্য হল জনসাধারনের স্বার্থ রক্ষা করা । কিন্তু বে-সরকারী প্রশাসনের উদ্দেশ্য হল মুনাফা অর্যন করা ।

২) সরকারী প্রশানকে জনগনের নিকট দায়িত্বশীল থাকতে হয় । কিন্তু বে-সরকারী প্রশাসনকে জনগনের নিকট দায়িত্বশীল থাকতে হয় না ।

C-11

5th Semester

প্রশ্ন : প্রশাসনের যে কোন দুটি নীতি উল্লেখ কর ।

উত্তর : ১) নির্দিষ্ট কিছু লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরনের জন্য নির্দেশ দান করা, সমন্বয় সাধন করা ও বহু মানুষকে নিয়ন্ত্রন করা ।

২) আইন বিভাগের গৃহিত আইনগুলিকে বাস্তবায়িত করা ।

প্রশ্ন : সরকারী প্রশাসন বলতে কি বোঝ ?

উত্তর : সরকারী প্রশাসন বা জনপ্রশাসন বলতে সেই প্রশাসনকে বোঝায় যা সরকারের সবধরনের কাজকর্ম এবং কাজকর্ম সম্পাদনের বিভিন্ন পদ্ধতির পর্যালোচনা করে ।

প্রশ্ন : বে-সরকারী প্রশাসন বলতে কি বোঝ ?

উত্তর : ব্যাক্তিগত বা গোষ্ঠিগত স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত যে কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের পরিচালন কার্য যখন একজন ব্যাক্তি বা কয়েকজন ব্যাক্তিকে নিয়ে গঠিত একটি পরিচালকবর্গ দ্বারা পরিচালিত হয় তখন তাকে ব্যাক্তিগত বা বেসরকারী প্রশাসন বলে ।

প্রশ্ন : জনপ্রশাসনে কেন্দ্রিকরন বলতে কি বোঝ ?

উত্তর : প্রশাসনিক ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব একটি সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের হাতে কেন্দ্রিভূত থাকে এবং সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ প্রশাসনের উপর সর্বব্যাপী নিয়ন্ত্রন কায়েম রাখে তখন তাকে কেন্দ্রিকরন বলা হয় ।

প্রশ্ন : জনপ্রশাসনে বিকেন্দ্রিকরন বলতে কি বোঝ ?

উত্তর : যখন প্রশাসনিক ক্ষমতা ও কর্তৃত্বকে কোন একটি বিশেষ কর্তৃপক্ষের হাতে কেন্দ্রিভূত না রেখে প্রশাসনের সর্বনিম্ন স্তর পর্যন্ত ছড়িয়ে দেওয়ে হয় তখন তাকে তাকে বিকেন্দ্রিকরন বলা হয় । কেন্দ্রিকরনের ফলে প্রশাসনের সর্বনিম্ন স্তরে অবস্থিত ইউনিটগুলি স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহন রুপায়নের ব্যাবস্থা করতে পারে ।

প্রশ্ন : POSDCORB- এর পূর্নাঙ্গ রুপটি লিখ ।

উত্তর : P-Planning

O - Organization
S - Staffing
D - Directing
Co - Co-ordinating
R - Reporting
B - Budgeting

প্রশ্ন : ``General and Industrial Management`` ও "Administrative Behaviour``-গ্রন্থদুটির প্রনেতাদের নাম লিখ ।

উত্তর : হেনরী ফেয়ল এবং রবার্ট সাইমন ।

প্রশ্ন : ক্রমোচ্চ স্তরবিন্যাস বলতে কি বোঝ ?

উত্তর : ক্রমোচ্চ স্তরবিন্যাস হল উপর থেকে নীচ পর্যন্ত উর্দ্ধতন ও অধস্তনদের মধ্যে পরস্পর সংযুক্ত হওয়া । এ ক্ষেত্রে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ অধস্তনদের উপর আদেশ জারী করতে পারে এবং অধস্তনরা উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের আদেশ মান্য করতে বাধ্য থাকে । সামরিক প্রশাসনে ক্রমোচ্চ স্তরবিন্যাসের আদর্শ রুপটি দেখতে পাওয়া যায় ।

প্রশ্ন : ক্রমোচ্চ স্তরবিন্যাস নীতির যে কোন দুটি সুবিধা উল্লেখ কর ।

উত্তর : ১) সংগঠনের কোন পদে এবং কোন দায়িত্বে কে আছেন সে ব্যাপারে প্রত্যেকের সুস্পষ্ট ধারনা থাকে ।

২) এই পদ্ধতিতে প্রশাসনিক জটিলতা পরিহার করে যে কোন বিশেষ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অধস্তন কেন্দ্র সিদ্ধান্ত গ্রহন করতে পারে ।

প্রশ্ন : আদেশের ঐক্য বলতে কি বোঝ ?

উত্তর : Henry Feyol -এর মতে আদেশের ঐক্য হল ‘‘an employee should receive order from one superior only ." অর্থাৎ একজন কর্মী শুধু একজন উর্দ্ধতন প্রশাসকের কাছ থেকেই আদেশ বা নির্দেশ পাবেন ।একজন অধস্তন ব্যাক্তির একজনই উপলওয়ালা থাকবেন ।

প্রশ্ন : নব জনপ্রশাসন বলতে কি বোঝ ?

উত্তর : সাতের দশকের শুরু থেকে জনপ্রশাসন সম্পর্কে নবীন গবেষকরা যে নতুন চিন্তার প্রবর্তন করেন নায়াগ্রো ও নায়াগ্রো তাকে নব জনপ্রশাসন বলেছেন ।নবাগতরা বলতে চেয়েছেন যে নয়া জনপ্রশাসনের লক্ষ হবে সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা । এবং সরকারী কর্মচারীগনের উচিত প্রশাসন যন্ত্রকে সেইভাবে পরিচালিত করা ।

প্রশ্ন : জনপ্রশাসন ও বে-সরকারী প্রশাসনের মধ্যে দুটি পার্থক্য উল্লেখ কর ।

উত্তর : ১) জনপ্রশাসনের উদ্দেশ্য হল জনসাধারনের স্বার্থ রক্ষা করা । কিন্তু বে-সরকারী প্রশাসনের উদ্দেশ্য হল মুনাফা অর্যন করা ।

২) সরকারী প্রশানকে জনগনের নিকট দায়িত্বশীল থাকতে হয় । কিন্তু বে-সরকারী প্রশাসনকে জনগনের নিকট দায়িত্বশীল থাকতে হয় না ।

প্রশ্ন : লোকসভার অধ্যক্ষের (স্পীকার) ক্ষমতা ও কার্য্যাবলী আলোচনা কর ।

উত্তর : লোকসভার সভাপতিকে অধ্যক্ষ বা স্পীকার বলে অভিহিত করা হয় । নব নির্বাচিত প্রথম অধিবেশনেই লোকসভার সদস্যগন নিজেদের মধ্যে থেকে একজন স্পীকার এবং একজন ডেপুটি স্পীকার নিবাড়াচন করেন । লোকসভায় যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠ্যতা অর্জন করে স্পীকার সাধারনত সেই দলেরই সদস্য হন । স্পীকারের মেয়াদ সাধারনত পাঁচ বছর ।

ক্ষমতা ও কার্য্যাবলী :

স্পীকারের নিম্নলিখিত ক্ষমতা ও কার্য্যাবলী রয়েছে -

১) **প্রশাসনিক ক্ষমতা :** স্পীকারের প্রশাসনিক ক্ষমতা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । সভায় কোন্ কোন্ ধরনের প্রস্তাব উত্থাপন করা হবে, কোন্ কোন্ নোটিশ আলোচনার জন্য গৃহিত হবে, কোনও সংশোধনী প্রস্তাব বৈধ কি না প্রভৃতি বিষয়ে অধ্যক্ষের সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত ।

২) **সভার নিয়ন্ত্রন সংক্রান্ত ক্ষমতা :** স্পীকার লোকসবার আলোচনা ও বিতর্ক নিয়ন্ত্রন করেন । কোন্ বিষয়ে আলোচনা কতক্ষন চলবে চা তিনিই স্থির করেন । লোকসভার কোন সদস্য যদি স্পীকারের নির্দেশ অমন্য করে তবে তিনি উক্ত সদস্যকে বহিস্কারের আদেশ দিতে পারেন ।

৩) **সদস্যদের অধিকার রক্ষা :** লোকসভার সদস্যদের অধিকার রক্ষার দায়িত্ব স্পীকারকেই পালন করতে হয় । যদি কখনোও কোন সদস্যের অধিকার ভঙ্গের কোন ব্যাপার ঘটে তাহলে তিনি অধিকার ভঙ্গকারীর বিরুদ্ধে যথোচিত ব্যবস্থা গ্রহন করতে পারেন । সংখ্যালঘু সদস্যদের অধিকার রক্ষার দায়িত্ব স্পীকারের উপর ন্যাস্ত থাকে ।

৪) **কোরাম সম্পর্কিত ক্ষমতা :** লোকসার 'কোরাম' না হলে অর্থাৎ নির্দিষ্ট সংখ্যক সদস্য উপস্থিত না থাকলে তিনি সবার কাজ সাময়িক ভাবে বন্ধ রাখতে পারেন । উল্লেযোগ্য, লোকসভার 'কোরা' হল মোট সদস্যে এক দশমাংশ ।

৫) **অর্থবিল নির্নয় :** কোন বিল অর্থবিল কিনা সে সম্পর্কে স্পীকারের সিদ্ধন্তই চুড়ান্ত । এরুপ বিল রাষ্ট্রপতির নিকট বা রাজ্য সভার নিকট প্রেরনের পূর্বে তাঁকে সংশ্লিষ্ট বিল সম্পর্কে সার্টিফিকেট প্রদান করতে হয় ।

৬) **কমিটি সংক্রান্ত ক্ষমতা :** সংসদীয় কমিটিগুলির প্রধান হিসাবে স্পীকার কাজ করেন । তাছাড়া, লোকসভার বিভিন্ন কমিটিগুলির প্রধানদের তিনিই নিয়োগ করেন । তিনি বিধি সম্পর্কিত কমিটি এবং কাজ-কর্ম পরিচালনা সম্পর্কিত উপদেষ্টা কমিটির সভায় সভাপতিত্ব করেন ।

৭) **যৌথ আধিবেশনে সভাপতিত্ব :** পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের যৌথ অধিবেশনে অধ্যক্ষ সভাপতিত্ব করেন । স্পীকারের নির্দেশ মতোই যৌথ অধিবেশনের কার্য পরিচালনা বিষয়ে নিয়ম কানুন স্থির হয় এবং প্রযুক্ত হয় ।

৮) **রাষ্ট্রপতি ও পার্লামেন্টের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা :** রাষ্ট্রপতি ও পার্লামেন্টের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করা স্পীকারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ । রাষ্ট্রপতির বাণব,বার্তা, বক্তব্য প্রভৃতি অধ্যক্ষের মাধ্যমেই পার্লামেন্টে উপস্থাপিত হয় । তেমনি লোকসভার যাবতীয় খবরা খবর সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে অবহিত করেন অধ্যক্ষ ।

৯) **গ্রেপ্তার সংক্রান্ত ক্ষমতা :** স্পীকারের সম্মতি ছাড়ালোকসভার কোন সদস্যকে পার্লামেন্টের চত্বরের মধ্যে পুলিশ গ্রেপ্তার করতে পারে না ।

১০) **ভোটদান সংক্রান্ত ক্ষমতা :** কোন বিষয়ে ভোটদানের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে অধ্যক্ষ সংশ্লিস্ট বিষয়ে ভোট গ্রহনের জন্য নির্দেস দিতে পরেন । কোন প্রস্তাবের পক্ষে ও বিপক্ষে সমান সংখ্যক ভোট পড়লে তিনি একটি 'নির্নায়ক ভোট' দিতে পারেন ।

উপসংহার : লোকসভার অধ্যক্ষের উপরোক্ত ক্ষমতা ও কার্য্যাবলীর আলোচনা থেকে থেকে আমরা একথা স্বীকার করতে বাধ্য যে, ভারতীয় সংবিধানে স্পিকারকে প্রভূত ক্ষমতা ও দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে । স্পীকারের গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নেহেরু মন্তব্য করেছিলেন, স্পীকার কক্ষের মর্য্যাদার ও স্বাধীনতার প্রতিভু । যেহেতু কক্ষ জাতির প্রতিনিধিত্ব করে, সেহেতু স্পীকার জাতির স্বাধীনতার প্রতীক । এই দিক দিয়ে স্পীকারের পদটি খুবই কর্তৃত্বপূর্ণ, সম্মানীয় এবং মর্য্যাদাসম্পন্ন । সেই জন্য এই পদে যিনি বসবেন তিনি খুবই অভিজ্ঞ, বিবেচক, কর্মকুশল ও বিশেষ ব্যাক্তিত্ব সম্পন্ন ব্যক্তি হবেন এটাই কাম্য ।

প্রশ্ন : ভারতের সুপ্রীম কোর্টের গঠন, ক্ষমতা ও কার্য্যাবলী আলোচনা কর ।

উত্তর : গঠন-- ভারতের সুপ্রীম কোর্ট মোট ৩১ জন বিচারপতি নিয়ে গঠিত হতে পারে । বর্তমানে সুপ্রীম কোর্টে মোট ২৬ জন বিচারপতি আছেন । ১জন প্রধান বিচারপতি ও ২৫ জন অন্যান্য বিচারপতি ।

ক্ষমতা ও কার্য্যাবলী : ভারতের সুপ্রীম কোর্টের ক্ষমতা ও কার্য্যাবলী আলোচনা করতে গেলে এর চারটি এলাকার কথা উল্লেখ করতে হবে । এগুলি হল-

১) মুল এলাকা ।
২) আপীল এলাকা ।
৩) পরামর্শদান এলাকা ।
৪) নির্দেশ বা আদেশ বা লেখ জারির এলাকা ।

১) মুল এলাকা : যে মামলাগুলি কেবলমাত্র সুপ্রীম কোর্টেই দায়ের করা যায়, হাই কোর্ট বা অন্য কোন অধস্তন আদালতে দায়ের করা যায় না সেগুলি মুল এলাকার অন্তর্গত । বর্তমানে মুল এলাকার অন্তর্ভূক্ত বিষয়গুলি হল -

i) কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে এক বা একাধিক রাজ্য সরকারের বিরোধ ।
ii) কেন্দ্রীয় সরকার এবং এক বা একাধিক রাজ্য সরকারের সঙ্গে অন্যান্য কয়েকটি বা একটি রাজ্য সরকারের বিরোধ ।
iii) দুই বা ততোধিক রাজ্য সরকারের বিরোধ ।
iv) রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতির নির্বাচন সংক্রান্ত বিরোধ ।

২) আপীল এলাকা : সুপ্রীম কোর্টে চার ধরনের আপীল করা যেতে পারে । এগুলি হল -

i) দেওয়ানী আপীল ।
ii) ফৌজদারী আপীল ।
iii) সংবিধানের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত আপীল ।
iv) বিশেষ অনুমতি সুত্রে আপীল ।

i) দেওয়ানী আপীল : দেওয়ানী মামলার ক্ষেত্রে হাই কোর্ট থেকা সুপ্রীম কোর্টে আপাইল করা জায় যদি হাই কোর্ট এই মর্মে প্রমান পত্র দেয় যে -

a) মামলাটির সঙ্গে কোন তাৎপর্য পূর্ণ আইনগত প্রশ্ন জড়িত আছে ।
b) হাই কোর্টের মতে মামলাটি সুপ্রীম কোর্টের নিকট আপীলযোগ্য ।

ii) ফৌজদারী আপীল : ফোজদারী মামলায় তিনটি ক্ষেত্রে হাই কোর্ট থেকা সুপ্রীম কোর্টে আপীল করা যায় । যেমন -

a) হাই কোর্ট কোন অভিযুক্ত ব্যক্তির মুক্তির আদেশ বাতিল করে দেয় এবং তাকে মৃত্যু দন্ডে দন্ডিত করে ।
b) হাই কোর্ট যদি কোন মামলা অধস্তন আদালত থেকা তুলে নেয় এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বিচারের পর মৃত্যু দন্ড দেয় ।

c) হাই কোর্ট যদি এই মর্মে প্রমান পত্র দেয় যে মামলাটি সুপ্রীম কোর্টের নিকট আপীলযোগ্য ।

iii) সংবিধানের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত আপীল : দেওয়ানী, ফোজদারী বা অন্য যেকোন মামলায় হাই কোর্ট যদি এই মর্মে প্রমান পত্র দেয় যে মামলাটির সঙ্গে গুরুত্বপূণর সাংবিধানিক প্রশ্ন জড়িত আছে তাহলে সুপ্রীম কোর্টে আপীল করা যায় ।

iv) বিশেষ অনুমতি সুত্রে আপীল : সংবিধানের ১৬৩(১) নং ধারা অনুসারে ভারতের যেকোন আদালত বা ট্রাইব্যুনালের রায়, আদেশ বা দন্ডের বিরুদ্ধে আপীল করার জন্য বিশেষ অনুমতি সুপ্রীম কোর্ট দিতে পারে ।

৩) পরামর্শদান এলাকা : প্রধানত দুটি ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি সুপ্রীম কোর্টের পরামর্শ চেয়ে পাঠাতে পারেন । এগুলি হল -

a) ১৪৩(১) নং ধারা অনুসারে রাষ্ট্রপতি যদি মনে করেন যে সর্বজনীন গুরুত্বসম্পন্ন আইন বা তথ্য সংক্রান্ত কোন সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে বা হওয়ার সম্ভাবনা আছে তা হলে তিনি তা সুপ্রীম কোর্টের কাছে বিচার বিবেচনার জন্য পাঠাতে পারেন ।

b) ১৪৩(২) নং ধারা অনুসারে সংবিধান চালু হওয়ার আগে সম্পাদিত সন্ধি, চুক্তি, অঙ্গীকার পত্র সনদ প্রভৃতির মধ্যে যেগুলি সংবিধান চালু হওয়ার পরেও কার্য্যকর আছে সেই সব বিষয়ে কোন বিরোধ দেখা দিলে রাষ্ট্রপতি সুপ্রীম কোর্টের পরামর্শ চেয়ে পাঠাতে পারেন ।

৪) নির্দেশ বা আদেশ বা লেখ জারির এলাকা : কোন নাগরিকের সংবিধান বর্নিত মৌলিক অধিকার ক্ষুন্ন হলে তিনি সুপ্রীম কোর্টে আবেদন করতে পারেন এবং তাঁর মৌলিক অধিকার রক্ষার জন্য সুপ্রীম কোর্ট পাঁচ ধরনের লেখ জারী করতে পারেন - বন্দি প্রত্যক্ষীকরন, পরমাদেশ, প্রতিষেধ, অধিকার পৃচ্ছা এবং উৎপ্রেষন ।

উপরোক্ত ক্ষমতা ও কার্য্যাবলী ছাড়াও সুপ্রীম কোর্ট আরোও কতগুলি ভূমিকা পালন করে । যেমন -

১) অভিলেখ আদালত হিসাবে ভূমিকা : অভিলেখ আদালত হিসাবে সুপ্রীম কোর্টের প্রথম কাজ হল বিচার কার্য্যের যাবতীয় কার্য্যবিবরনী নিঁখুত ভাবে নথিভুক্ত করা ও সরকারী দপ্তরে যত্ন সহকারে সংরক্ষন করা । যেগুলি পরবর্তীকালে আইনের নজীর হিসাবে গন্য হবে ।

তাছাড়া নিজের অবমাননার জন্য সুপ্রীম কোর্ট তদন্ত করতে পারেন এবং অবমাননাকারীকে শাস্তি দিতে পারেন ।

২) সংবিধানের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত কাজ : আইন নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে সুপ্রীম কোর্ট আইনসা প্রণীত আইন এবং শাসন বিভাগীয় আদেশ, নির্দেষ প্রভৃতির সাংবিধানিকতা বিচার করে তা বৈধ বা অবৈধ বলে ঘোষনা করতে পারেন ।

৩) তত্ত্বাবধান মুলক কাজ : সমগ্র দেশের হাই কোর্টগুলি ছাড়াও অন্যান্য যেকোন অধস্তন আদালতের কার্য্যাবলী তত্ত্বাবধান করা ও সেই সমপর্কে যেকোন ব্যবস্থা সুপ্রীম কোর্ট গ্রহন করতে পারে ।

৪) জনস্বার্থ মামলা গ্রহন : যেকোন ধরনের জনস্বার্থ মামলা গ্রহনের ক্ষেত্রে সুপ্রীম কোর্ট বর্তমানে অতি তৎপরতা দেখাচ্ছে । জনস্বার্থ মামলার ক্ষেত্রে সুপ্রীম কোর্টের এই ভূমিকাকে বিচার বিভাগীয় সক্রিয়তা বলে অভিহিত করা হচ্ছে ।

উপসংহার : সুপ্রীম কোর্ট-এর উপরোক্ত ক্ষমতা ও কার্য্যাবলী পর্যালোচনা করে A.K.Aiyar মন্তব্য করেছেন, "The Supreme Court of Indian Union has more powers than any Supreme Court in any part of thae world .`` তবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ভারতের সুপ্রীম কোর্ট আইনের বৈধতা বা যুক্তিসিদ্ধতা বিচার করতে পারলেও মার্কীন সুপ্রীম কোর্টের মতো আইনের ন্যায় সঙ্গতা বিচার করতে পারেন না ।

প্রশ্ন : উত্তর আধুনিক নারীবাদের উপর একটি টীকা লেখ ।

উত্তর : বিভিন্ন ধারার নারীবদের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য ধারা হল উত্তর আধুনিক নারীবাদ । এই ধারার প্রধান প্রবক্তা হলেন জুডিথ বাটলার এবং ডোনা হারাওয়ে । ১৯৯০ সালে প্রকাশিত 'Gender Trouble`গ্রন্থে বাটলার জৈবিক লিঙ্গ সাংস্কৃতিক লিঙ্গের মধ্যে যে পার্থক্য করা হয় তার সমালোচনা করেছেন । বাটলারের মতে নারী একটি জটিল ও বিতর্কিত বর্গ । শ্রেণী , আদিম জনগোষ্ঠি, যৌনতা ও অন্যান্য বিভিন্ন পরিচিতি নারীবর্গকে জটিল করে তুলেছে । তাই কোন একটি দৃষ্টিকোন বা তত্ত্বের সাহায্যে নারীর অবদানের দিকটি বোঝা সম্ভব নয় ।বিষয়টিকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে পর্যালোচনা করা উচিত । এই গ্রন্থে তিনি আরোও বলেন যে জৈবিক লিঙ্গ অর্থাৎ নারী শরীরও নির্মিত । ভাষা, সংস্কৃতি প্রভৃতিও নারীর শরীরকে নির্মান করে । ফলে অন্যান্য ধারার নারীবাদী তাত্ত্বিকরা জৈবিক লিঙ্গ ও সাংস্কৃতিক লিঙ্গের মধ্যে যে পার্থক্য করেছেন তা ঠিক নয় ।

ডোনা হারাওয়ে 'A Cyborg Manifesto`` প্রবন্ধে প্রচলিত জৈবিক লিঙ্গ ও সাংস্কৃতিক লিঙ্গের মধ্যে পার্থক্যের সমালোচনা করাছেন । তাঁর মতে বিষয় বা বিষয়ী, প্রকৃতি বা সংস্কৃতি, শরীরের উপর নিয়ন্ত্রন বা নিয়ন্ত্রনের অভাব প্রৃতি আলোচনার মধ্যে এনেছেন ।

উত্তর আধুনিক নারীবাদ সবক্ষেত্রেই সুসংহত তত্ত্বায়নের বিরোধীতা করে । উত্তর আধুনিক নারীবাদ অনুসারে মানুষের অভিজ্ঞতা ভাষার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ভাবে যুক্ত । ভাষা বাস্তবকে নির্মান করে, সীমিত করে এবং নিয়ন্ত্রন করে । সেই কারনে ক্ষমতা কেবলমাত্র শক্তির মাধ্যমে প্রয়োগ করা হয়না । ভাষার মধ্য দিয়েও প্রয়োগ করা যায় । ভাষাকে পুনরায় বিশ্লেষন করা যায় বলে ভাষাকে সংগ্রামের একটি পরিসর হিসাবে চিহ্নিত করা যায় । উত্তর আধুনিক নারীবাদ আরোও মনে করে যে জৈবিক লিঙ্গ ও নারীদেহ প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক নয় । একে সংজ্ঞায়িত করা সহজ নয় । কারন নারীদেহকে অর্থপূর্ণ করে তোলে সাংস্কৃতিক ভাষা । জৈবিক লিঙ্গের মধ্যে পার্থক্য প্রকৃতিগত নয় । এটি সাংস্কৃতির দ্বারা । এবং সেই কারনে একে অতিক্রম করাও সম্ভব ।

প্রশ্ন:- রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনায় উত্তর আচরনবাদী দৃষ্টিভঙ্গিটি বিশ্লেষন কর।

উত্তর:-আচরণবাদীগন প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের কলা কৌশল ব্যবহার করে রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে সচেস্ট হয়েছিলেন। আচরণবাদীগন সাবেকি ধারার মুল্যবোধযুক্ত দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রত্যাখান করে মুল্য নিরপেক্ষ বিশ্লেষনে সচেস্ট হন। আচরণবাদীরা মনে করেন যে 'কি হওয়া উচিত'- এই ধারনা রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের আলোচনার বিষয়বস্তু হতে পারে না। বাস্তবে 'কি ঘটছে'- এটাই আলোচনার বিষয়বস্তু হওয়া উচিত। কিন্তু ১৯৬০-এর দশকে আচরণবাদীগন বেশ কিছু সমস্যার সম্মুখীন হন। মার্কীন সমাজের ক্রমবর্ধমান সংকট রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদেরকে নতুন ভাবে চিন্তা-ভাবনা করতে বাধ্য করে। তাঁরা এটা মেনে নিতে বাধ্য হন যে রাষ্ট্রবিজ্ঞান যদি সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যাগুলির সঠিক পথ দেখাতে না পারে বা সনাতন সামাজিক মুলবোধগুলিকে প্রতিষ্ঠা করে শান্তি ও প্রগতির লক্ষ্যে বৌদ্ধিক চর্চাকে পরিচালিত করতে না পারে তবে রাষ্ট্রবিজ্ঞান ক্রমশ:ই প্রসিঙ্গতা হারাবে। আচরনবাদী তত্ত্বের বিরুদ্ধে এই আন্দোলনই আচরনবাদোত্তর আন্দোলন বা উত্তর আচরণবাদী আন্দোলন (Post behavioral movement) নামে পরিচিত।

ডেভিড ইস্টন ১৯৬৯ সালে সেপ্টেম্বর মসে 'The American Political Science Association'-এর ৬৫ তম বার্ষিক সভায় সভাপতিত্ব করেন। এই সভায় তিনি আচরনবাদোত্তর আন্দোলনের মুল বক্তব্যকে তুলে ধরেন। ইস্টনের মতে, উত্তর আচরণবাদ হল একটি নতুন বিপ্লব (The new revolution of political science). ইস্টনের মতে, এই নতুন বিপ্লব সাবেকি রাজনৈতিক তত্ত্বের প্রবক্তাদের মত অতীতের প্রতি অনুরক্ত নয়। এই বিপ্লব ভবিষ্যত ভিত্তিক (future oriented)। এই বিপ্লব রাজনৈতিক গবেষনার সুবর্নযুগে প্রত্যাবর্তন করতে চায় না, অথবা এই বিপ্লব কোন নির্দিষ্ট আলোচনা পদ্ধতিকে সংরক্ষণ বা ধ্বংস করতে চায় না। এই বিপ্লবের লক্ষ্য হল রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে নতুন নিশানায় নিয়ে যাওয়া। তিনি আরোও বলেন, ''এই নতুন অগ্রগতি একটি প্রকৃত বিপ্লব,কোন প্রতিক্রিয়া নয়। একটি পরিনতি, কোন বিশেষ ব্যবসথার সংরক্ষন নয়।। এই বিপ্লব একটি সংসকারকামী আন্দোলন, কোন সংসকার বিরোধী প্রচেস্টা নয়। তাঁর কথায়,"This new development is then a genuine revolution, not a reaction, a becoming, not a preservation, a reform, not a custom, not a counter reformation.''

আচরনবাদোত্তর আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য:-

ডেভিড ইস্টন আচরনবাদোত্তর আন্দোলনের বৈশিষ্ট্যগুলিকে চিহ্নিত করা সম্ভব বলে মনে করেন। এই বৈশিষ্ট্যগুলিকে তিনি 'বিশ্বাসের প্রাসঙ্গিকতা'(credo of relevence)নামে অভিহিত করেছেন। নিম্নে আচরনবাদোত্তর আন্দোলনের মৌল বৈশিষ্ট্য গুলি তুলে ধরা হল।-

১) উত্তর আচরণবাদ আচরনবাদের মত অনুসন্ধান ও গবেষনার ক্ষেত্রে উন্নত কলাকৌশল প্রয়োগের উপর বেশী গুরুত্ব দেয় না। এখানে কৌশলের তুলনায় বক্তব্যের উপর বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়। এখানে সাম্প্রতিক কালের গুরুত্বপুর্ন ও প্রয়োজনীয় সামাজিক সমস্যা সমাধানের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

২) আচরনবাদ অতিমাত্রায় বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হতে গিয়ে মুল্যবোধকে বিসর্জন দিয়েছে। উত্তর আচরণবাদ রাজনৈতিক আলোচনায় মুল্যবোধকে পুন:প্রতিষ্ঠিত করেছে। উত্তর আচরণবাদ মনে করে যে, মানুষের রাজনৈতিক ও সামাজিক কাজকর্মের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপুর্ণ চালিকা শক্তি হল মুল্যবোধ। রাষ্ট্রবিজ্ঞান গবেষনায় সামাজিক মুল্যবোধকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।

৩) উত্তর আচরণবাদ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের গবেষনায় সামাজিক স্থিতাবস্থার পরিবর্তে পরিবর্তনকে বেশী গুরুত্ব দেয়। আচরনবাদে সামাজিক রক্ষনশীলতা গুরুত্বপুর্ণ হয়ে উঠেছে। কেননা আচরনবাদ একটি নির্দিষ্ট কাঠামোর মধ্যে ব্যক্তি ও গোষ্ঠির আচরনকে বিশ্লেষন করার চেষ্টা করেছে। উত্তর আচরণবাদ অনুসারে রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে হতে হবে বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের গবেষনার অন্যতম লক্ষ্য হবে বৃহত্তর সমাজের সাথে সংশ্লিষ্ট সামাজিক পরিবর্তনগুলিকে চিহ্নিত করা।

৪) উত্তর আচরণবাদের বক্তব্য হল আচরনবাদী আলোচনা বাস্তবের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে বাধ্য। আচরনবাদী অনুসন্ধানের মৌল বিষয় হল বিমুর্ত্ততা (abstraction) এবং বিশ্লেষণ। এর মাধ্যমে রাজনীতির কঠিন কঠোর বাস্তবকেই আড়াল করে রাখা হয়। আচরনবাদোত্তর আন্দোলনের উদ্দেশ্য হল আচরনবাদীদের ভাষা ও বক্তব্যের মাধ্যমে গড়ে উঠা নীরবতার ভাষা পরিহার করা।(to break the barrier of silence that behavioral language necessarily has created)। সংকটের সময় যাতে রাষ্ট্রবিজ্ঞান মানবজাতির প্রকৃত প্রয়োজন পূরন করতে পারে, সেই ব্যাবস্থা গ্রহন করাই এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য।

৫) উত্তর আচরণবাদ অনুসারে কোন উন্নত এবং জ্ঞানদীপ্ত বিষয়ের (learned discipline) সাথে জড়িত সদস্যগনই হলেন বুদ্ধিজীবি। এই বুদ্ধিজীবিদের সামাজিক দয়িত্ব বহন করতে হবে। বুদ্ধিজীবিদের ঐতিহাসিক কর্তব্য হল সভ্যতার মানবিক মুল্যবোধকে রক্ষা করা। এটা তাঁদের বিশেষ দায়িত্ব এবং সামাজিক বাদ্যবাধকতা। এই দায়িত্ব পালন না করলে তাঁদের প্রযুক্তিবিদ এবং কারিগরের সমকক্ষ বলে গন্য করা হবে।

৬) উত্তর আচরণবাদ অনুসারে কোন কিছু জানার অর্থ হল কার্য সাধনের জন্য দায়িত্বভার বহন করা। (to know is to bear the responsibility of acting)। কাজ করার অর্থ হল সামাজিক পুনর্বিন্যাসের কাজে নিজকে নিযুক্ত করা। বিজ্ঞানী হিসাবে কোন বুদ্ধিজীবির বিশেষ বাধ্যবাধকতা হল নিজের জ্ঞানকে সামাজিক কাজে প্রয়োগ করা।

৭) উত্তর আচরণবাদ অনুসারে নিজেদের জ্ঞানকে প্রয়োগ করাই যদি বুদ্ধিজীবিদের দায়িত্ব হয়, তাহলে পেশাদারী সংগঠন এবং বিশ্ববিদ্যালয় সহ বুদ্ধিজীবি দ্বারা গঠিত কোন সংগঠনই বর্তমানের সংগ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে পারে না। এ জন্যই পেশার রাজনীতিকরন অবশ্যম্ভাবী এবং কাম্য।

মুল্যায়ন:-

ডেভিড ইস্টন আচরনবাদোত্তর আন্দোলনের স্বপক্ষে যে বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন আচরনবাদ বিরোধী মতামত অবশ্যই প্রকাশিত হয়েছে। আবার এই বক্তব্যের মধ্যে তথ্য ও মুলতবোধ, আদর্শস্থাপনকারী এবং অভিজ্ঞতাবাদী তত্বের সমন্বয় সাধনেরও চেস্টা হয়েছে। তবে একথা অনস্বীকার্য্য যে আচরনবাদোত্তর আন্দোলন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের নতুন ভাবমুর্তী উপস্থাপন এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের নতুন দায়িত্ববোধ সৃষ্টি করেছে। এই আন্দোলন বিশব সম্পর্কে এমন এক দৃষ্টিভঙ্গী সৃষ্টি করেছে যা মানবিক মানবিক মানদন্ড অনুযায়ী রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের সমস্যার সমাধানে এবং রাজনৈতিক জীবনের মানোন্নয়নে উৎসাহিত করবে।

SEC -1
3rd Semester

প্রশ্ন : প্রশ্নোত্তর পর্বে ক'ধরনের প্রশ্ন উত্থাপিত হয় ?

উত্তর : প্রশ্নোত্তর পর্বে দু'ধরনের প্রশ্ন উত্থাপিত হয় । এগুলি হল তারকা চিহ্নিত ও সাধারন তারকা বিহীন প্রশ্ন । তারকাচিহ্নিত প্রশ্নের উত্তর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীকে সভায় মৌখিক ভাবে দিতে হয় । তারকাবিহীন প্রশ্নের লিখিত উত্তর সভার টেবিলে জমা পড়ে । এছাড়া প্রশ্নোত্তর পর্ব চলাকালীন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর উত্তর দেওয়ার পর প্রশ্নকারী সদস্য অধ্যক্ষের অনুমতি নিয়ে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অতিরিক্ত প্রশ্ন করতে পারেন ।

প্রশ্ন : মুলতবী প্রস্তাব কি ?

উত্তর : যদি এমন কোন বিষয় অত্যন্ত জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ হয় যার ফলে দেশের বা রাজ্যের স্বার্থ ক্ষুন্ন হতে পারে এবং ব্যাপারটা এতই জরুরি যে কোনভাবেই দেরি করা যায় না তাহলে এরকম বিষয়ে অধ্যক্ষের অনুমতিক্রমে সভায় মুলতবী প্রস্তাব আনা যায় । মুলতবী প্রস্তাবের নোটিশ অধিবেশন শুরু হওয়ার আগেই দিতে হয় । মুলতবী প্রস্তাব সভায় আলোচনার জন্য গৃহিত হলে সেদিনের সভার আন্যান্য সমস্ত কাজ মুলতবী হয়ে যায় ।

প্রশ্ন : দৃষ্টিআকর্ষনী প্রস্তাব কি ?

উত্তর : দৃষ্টিআকর্ষনী প্রস্তাবের মাধ্যমে সদস্যরা কোনও জরুরি বিষয়ের বিভিন্ন দিক নিয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষনের সুযোগ পান । অন্যদিকে সরকারও ওই বিষয়ের সরকারি নীতি ও পদক্ষেপের ব্যাখ্যা রাখার সুযোগ পায় । যে কোন সদস্য অধ্যক্ষের পূর্ব অনুমতি নিয়ে জনস্বার্থের দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষন করতে পারেন ।

প্রশ্ন : উল্লেখ পর্ব কি ?

উত্তর : দৃষ্টিআকর্ষনী প্রস্তাব পর্ব শেষ হওয়ার পর একঘন্টা সময়ের জন্য সদস্যগন অধ্যক্ষের অনুমতিক্রমে নিজ নিজ এলাকার কিংবা রাজ্যের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট নানা বিষয়ে স্বল্প বক্তব্যের মাধ্যমে সভা তথা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষনের সুযোগ পান । এটিই বিধানসভার কার্যবিবরনীতে উল্লেখ পর্ব নামে লিপিবদ্ধ ।

প্রশ্ন : জিরো আওয়ার কি ?

উত্তর : সংসদীয় প্রতিদিনের যে কার্যাবলী সেই কার্যাবলীকে দুটি পর্বে ভাগ করা হয় - ১) সরকারী কার্যাবলী এবং ২) অ-সরকারী কার্যাবলী । অধিবেশনের প্রথমে অ-সরকারী কার্যাবলী শেষ হওয়ার পর এবং সরকারী কার্যাবলী শুরু হওয়ার আগে কোন সময়ের অবকাশ থাকে না বলে এই সময়টিকে জির আওয়ার বলা হয় । জিরো আওয়ারে সদস্যগন অতি-সম্প্রতি ঘটে যাওয়া জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোনও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সভায় উত্থাপন করতে পারেন ।

প্রশ্ন : অনাস্থা কি ?

উত্তর : সংসদীয় গনতন্ত্রে সরকার লোকসভা বা রাজ্যের ক্ষেত্রে বিধানসভার কাছে দায়িত্বশীল থাকেন । সরকার চালাতে গেলে সরকারের পক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠ্য সদস্যের সমর্থন বা আস্থা থাকা একান্ত প্রয়োজন । কিন্তু বিরোধীরা যদি মনে করেন যে এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে যে সরকারের পক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন এই মুহূর্তে নেই আর্থৎ সভা এই সরকারের বিরুদ্ধে আনাস্থা প্রকাশ করছে তখন বিরোধীরা সকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে আসে । অনাস্থা গোটা মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে আনতে হয় । ব্যাক্তিগতভাবে কোন একজন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে তা আনা যায় না ।

প্রশ্ন : বিল কি ?

উত্তর : আইনের খসড়াকে বিল বলে । কোন বিল আইনসভায় তিনটি পঠনের পর ভোটাভুটিতে গৃহিত হলে রাষ্ট্রপতি /রাজ্যপালের কাছে অনুমতির জন্য পাঠানো হয় । অনুমতি বা স্বাক্ষর পেলে বিলটি আইনে পরিনত হয় ।

প্রশ্ন : চারটি স্থায়ী কমিটির নাম লেখ ।

উত্তর : ১) আনুমানিক ব্যয় পরীক্ষা কমিটি
২) সরকারী হিসাব পরীক্ষা কমিটি
৩) নিয়মাবলী সংক্রান্ত কমিটি
৪) কার্যপরিচালনা সংক্রান্ত পরামর্শদাতা কমিটি

প্রশ্ন : আনুমানিক ব্যয় পরীক্ষা কমিটি কিভাবে গঠিত হয় ?

উত্তর : আনুমানিক ব্যয় পরীক্ষা কমিটি মোট ৩০ জন সদস্যকে নিয়ে গঠিত হয় । সদস্যরা সকলেই লোকসভার সদস্য । সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে সদস্যরা নির্বাচিত হন । কোন মন্ত্রী এই কমিটির সদস্য হতে পারেন না । সদস্যদের মধ্য থেকে স্পীকার একজনকে সভাপতি নিযুক্ত করেন ।

প্রশ্ন : আনুমানিক ব্যয় পরীক্ষা কমিটির দুটি কাজ উল্লেখ কর ।

উত্তর : ১) কমিটি সরকারের বিভিন্ন বিভাগের আনুমানিক ব্যায় সংক্রান্ত দাবিগুলি পর্যালোচনা করে এবং কীভাবে ব্যয়সংকোচ করা যায় সে ব্যাপারে লোকসভার কাছে দাবী পেশ করে ।

২) শাসনকার্য পরিচালনার ব্যাপারে দক্ষতা বৃদ্ধি এবং ব্যয়সংক্ষেপের জন্য কমিটি বিকল্প নীতি প্রস্তাব করতে পারে ।

প্রশ্ন : সরকারী হিসাব পরীক্ষা কমিটি কিভাবে গঠিত হয় ?

উত্তর : মোট ২২জন সদস্যকে নিয়ে এই কমিটি গঠিত হয় । এর মধ্যে ১৫ জন সদস্য লোকসভা থেকে এবং ৭জন সদস্য রাজ্যসভা থেকে মনোনীত হন । সদস্যারা একক হস্তান্তরযোগ্য সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে নির্বাচিত হন । স্পীকার বিরোধীদের মধ্য থেকে একজনকে সভাপতি হিসাবে নিযুক্ত করেন ।

প্রশ্ন : সরকারী হিসাব পরীক্ষা কমিটির দু'টি কাজ উল্লেখ কর ।

উত্তর : ১) পার্লামেন্ট যে বিভাগকে যত পরিমান অর্থ মঞ্জুর করেছে সে বিভাগ সেই অর্থ ভারতের সঞ্চিত তহবিল থৈকে তুলেছেন কিনা তা পরীক্ষা করা ।

২) যে উদ্দেশ্যে অর্থ মঞ্জুর করা হয়েছে তা সেই উদ্দেশ্যের বাস্তব রুপায়নে ব্যয় করা হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করা ।

প্রশ্ন : বাজেট কি ?

উত্তর : প্রতিটি আর্থিক বছর শেষ হওয়ার আগে পরবর্তী আর্থিক বছরের জন্য যে আয়ব্যয়ের খসড়া প্রস্তুত করা হয় তাকে বাজেট বলে । সরকারের আর্থিক বছর শুরু হয় ১লা এপ্রিল থেকে ।

প্রশ্ন : লোকসভায় বাজেট কে পেশ করেন ?

উত্তর : রাষ্ট্রপতির অনুমতি ও নির্দেশক্রমে অর্থমন্ত্রী লোকসভায় বাজেট পেশ করেন ।

প্রশ্ন : লোকসভায় ক'ধরনের ছাঁটাই প্রস্তাব উত্তাপিত হয় ?

উত্তর : লোকসভায় তিন ধরনের ছাঁটাই প্রস্তাব উত্তাপিত হয় -১) ব্যয়সংক্ষেপের জন্য ছাঁটাই প্রস্তাব, ২) নীতি-অনুমোদন সংক্রান্ত ছাঁটাই প্রস্তাব, ৩) প্রতীকী ছাঁটাই প্রস্তাব ।

প্রশ্ন : গনানুদান কি ?

উত্তর : যতদিন বিনিয়োগ আইন প্রণীত না হয় ততদিন পর্যন্ত ব্যয়নির্বাহের জন্য নতুন আর্থিক বছর শুরু হওয়ার আগেই লিকসভা সরকারকে অগ্রব্যয়ের আনুমতি প্রদান করে । এই ব্যবস্থাকে গনানুদান বলে ।

প্রশ্ন : মহাহিসাব নিয়ামক ও নিরীক্ষকের কাজ কি ?

উত্তর : পার্লমেন্ট নির্দিষ্ট খাতে যে নির্দিষ্ট পরিমান অর্থ মঞ্জুর করে সে অর্থ যথাযথ ভাবে সংশ্লিষ্ট খাতে ব্যয়িত হচ্ছে কিনা তা পরীক্ষা করাই হল মহাহিসাব নিয়ামক ও নিরীক্ষকের প্রধান কাজ । তিনি প্রতি বছরের হিসাব পরীক্ষা করে রাষ্ট্রপতির কাছে রিপোর্ট পেশ করেন । রাষ্ট্রপতি ওই রিপোর্ট পার্লামেন্টের কাছে পেশ করার ব্যাবস্থা করেন ।

প্রশ্ন:- রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনায় আচরনবাদী দৃষ্টিভঙ্গীটি আলোচনা কর।

উত্তর:-আচরনবাদ হল রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মধ্যে একটি 'প্রতিবাদ' এবং 'বৌদ্ধিক' আন্দোলন বিশেষ। মানুষ ও তার আচরনের উপর গুরুত্ব আরোপ করে আচরনবাদ। রাজনৈতিক জগতে মানুষের জটিল প্রকৃতির আচরন বিশ্লেষন করার জন্য তথ্য ও পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা এবং সংগৃহিত পরিসংখ্যান ও তথ্যের উপর ভিত্তি করে অভিজ্ঞতাবাদী তত্ত্ব গড়ে তোলার লক্ষ্যই হল আচরনবাদ।

বিংশ শতকের প্রথম দশকেই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনার এক নতুন পদ্ধতির প্রবনতা লক্ষ্য করা গেল। মর্কীন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সনাতনী দৃষ্টিভঙ্গীকে প্রত্যাখান করে রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান ভিত্তিক করতে সচেষ্ট হলেন। এই নতুন ধারা লক্ষ্য করা গেল ১৯০৮ সালে প্রকাশিত গ্রহাম ওয়ালশ্-এর 'Human Nature in Politics' এবং আর্থার বেন্টলে-এর 'The Process of Government' গ্রন্থগুলির মধ্য দিয়ে। এই প্রথম রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনায় রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তে মানুষের রাজনৈতিক আচরনের উপর গুরুত্ব দেওয়া হল।এর পর ১৯২৫ সালে চার্লস্ মেরিয়ামের 'New Aspects Of Politics' প্রকাশিত হয়। এখানে তিনি ভৌত বিজ্ঞানের বিভিন্ন কলাকৌশল রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনায় প্রয়োগ করা সম্ভব বলে মত প্রকাশ করেন।চার্লস্ মেরিয়ামের নেতৃত্বে 'শিকাগো গোষ্ঠী' আচরনবাদকে এক আন্দোলনে পর্যবসিত করে। তাই চার্লস্ মেরিয়ামকেই আচরনবাদের জনক বলা হয়। ১৯৫৩ সালে ডেভিড ইস্টনের 'Political System-an Enquiry into the State of Political Science' প্রকাশিত হলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনার এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। তিনি 'Input-Output' বিশ্লেষনের মাধ্যমে রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে সম্পুর্নরুপে বিজ্ঞান হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেন।

আচরনবাদের বৈশিষ্ঠ্য:-

ডেভিড ইস্টন আচরনবাদের ৮টি বৈশিষ্ঠ্যের উল্লেখ করেছেন। এগুলি হল -

১) নিয়মমাফিকতা ২) সত্যতা প্রমান
২) কৌশল উদ্ভাবন ৩) সংখ্যায়ন
৪) মুল্যবোধ নিরপেক্ষতা ৫) নিয়মাবদ্ধ সুস্মন্ধকরন
৭) বিশুদ্ধ বিজ্ঞান ৮) সংহতিসাধন

ই.এম.কার্কপেট্রিক আচরনবাদের চারটি বৈশিষ্ঠ্যের উল্লেখ করেছেন-

১) আচরনবাদ মানুষের রাজনৈতিক আচরনকেই বিশ্লেষনের মুখ্য বিষয় হিসাবে গ্রহন করে।
২) আচরনবাদ অন্যান্য সমাজ বিজ্ঞানের সাথে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ঐক্য সাধনের উপর গুরুত্ব আরোপ করে।
৩) আচরনবাদ পরিসংখ্যান ও তথ্য পরীক্ষা, শ্রেনী বিভাজন এবং পরিমাপের জন্য কৌশল অবলম্বন করে।
৪) আচরনবাদ সুসংবদ্ধ এবং অভিজ্ঞতাবাদী তত্ব গঠনে উদ্যোগ গ্রহন করে।

ইউলাও, এল্ডারভেল্ড এবং জ্যানোউটজ্ আচরনবাদের চারটি বৈশিষ্ঠ্যের উল্লেখ করেছেন-

১) আচরনবাদ ঘটনা, কাঠামো, প্রতিষ্ঠান অথবা মতাদর্শের পরিবর্তে ব্যাক্তির আচরনকে তাত্ত্বিক এবং অভিজ্ঞতাবাদী বিশ্লেষনের বিষয় রুপে গ্রহন করে।
২) আন্ত:সমাজবিজ্ঞানমুখী আলোচনা করে।
৩) তত্ত্ব ও গবেষনার পারস্পরিক নির্ভরশীলতার উপর গুরুত্ব আরোপ করে।
৪) রাজনৈতিক আচরনের সমস্যার ক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষন পদ্ধতি প্রয়োগ করে।

উপরোক্ত বিভিন্ন আচরনবাদীদের মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আচরনবাদের সাধারন বৈশিষ্ঠ্য গুলিকে এভাবে

তুলে ধরা যেতে পারে-

১) আচরনবাদ আলোচনাকে মূল্যমান নিরপেক্ষ রাখতে চায়।

২) আচরনবাদ অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞান সমূহের সাথে ঘনিষ্ঠ্য সম্পর্ক স্থাপনের উপর জোর দেয়।

৩) আচরনবাদ তত্ত্ব ও গবেষনার পারস্পরিক নির্ভরশীলতার উপর গুরুত্ব আরোপ করে।

৪) আচরনবাদ রাজনৈতিক আচরন পর্যালোচনার ক্ষেত্রে ভৌত বিজ্ঞানের ন্যায় নিয়মানুবর্তিতা, সংখ্যায়ন, ধারনার সুসংহতকরন, সংহতিসাধন প্রভৃতির উপর জোর দেয়।

৫) আচরনবাদ কাঠামো, প্রতিষ্ঠান, মতাদর্শ, প্রভৃতির পরিবর্তে ব্যাক্তির আলোচনার উপর গুরুত্ব আরোপ করে।

সমালোচনা:-

১) আচরনবাদ রক্ষনশীল মতবাদ। প্রচলিত বর্জোয়া সমাজকে কি ভাবে টিকিয়ে রাখা যায় তারই উপায় নির্ধারনে ব্যাস্ত আচরনবাদ। সমাজ পরিবর্তনের জন্য আচরনবাদ কোন উৎসাহ দেখায়নি।

২) আচরনবাদ পদ্ধতি, তথ্য ও পরিসংখ্যান সংগ্রহের উপর অত্যাধিক সময় ব্যায় করেছে। কিন্তু মানুষের জটিল রাজনৈতিক আচরনের নিখুঁত তথ্য ও পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা সম্ভব নয়।

৩) আচরনবাদ মুল্যবোধকে অগ্রাহ্য করেছে যা ভ্রান্ত বলে পরিগনিত হয়েছে। এজন্য আচরনবাদোত্তর বিপ্লবের উদ্ভব হয়েছে। যেখানে মুল্যবোধকে পুনরায় গুরুত্ব দিতে বাধ্য হয়েছে।

৪) আচরনবাদ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের স্বাতন্ত্র্যতাকে ক্ষুন্ন করেছে।

৫) আচরনবাদ যে রাষ্ট্রহীন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ধারনা প্রচার করেছে তা পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের ভয়াবহ রুপ আড়ালের জন্যই।

উপরোক্ত সমালোচনাগুলি থাকা সত্ত্বেও বলা যায় যে, আচরনবাদ চিরাচরিত রাজনৈতিক আলোচনার পথ অতিক্রম করে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনায় যে নতূন পদ্ধতির অবতারনা করেছে এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিজ্ঞান শব্দটিকে জোরালো ভাবে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছে তার গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না।

প্রশ্ন:- রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনায় আচরনবাদী দৃষ্টিভঙ্গীটি আলোচনা কর।

উত্তর:-আচরনবাদ হল রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মধ্যে একটি 'প্রতিবাদ' এবং 'বৌদ্ধিক' আন্দোলন বিশেষ। মানুষ ও তার আচরনের উপর গুরুত্ব আরোপ করে আচরনবাদ। রাজনৈতিক জগতে মানুষের জটিল প্রকৃতির আচরন বিশ্লেষন করার জন্য তথ্য ও পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা এবং সংগৃহিত পরিসংখ্যান ও তথ্যের উপর ভিত্তি করে অভিজ্ঞতাবাদী তত্ত্ব গড়ে তোলার লক্ষ্যই হল আচরনবাদ।

বিংশ শতকের প্রথম দশকেই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনার এক নতুন পদ্ধতির প্রবনতা লক্ষ্য করা গেল। মর্কীন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সনাতনী দৃষ্টিভঙ্গীকে প্রত্যাখান করে রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান ভিত্তিক করতে সচেষ্ট হলেন। এই নতুন ধারা লক্ষ্য করা গেল ১৯০৮ সালে প্রকাশিত গ্রহাম ওয়ালশ্-এর 'Human Nature in Politics' এবং আর্থার বেন্টলে-এর 'The Process of Government' গ্রন্থগুলির মধ্য দিয়ে। এই প্রথম রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনায় রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তে মানুষের রাজনৈতিক আচরনের উপর গুরুত্ব দেওয়া হল।এর পর ১৯২৫ সালে চার্লস্ মেরিয়ামের 'New Aspects Of Politics' প্রকাশিত হয়। এখানে তিনি ভৌত বিজ্ঞানের বিভিন্ন কলাকৌশল রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনায় প্রয়োগ করা সম্ভব বলে মত প্রকাশ করেন।চার্লস্ মেরিয়ামের নেতৃত্বে 'শিকাগো গোষ্ঠী' আচরনবাদকে এক আন্দোলনে পর্যবসিত করে। তাই চার্লস্ মেরিয়ামকেই আচরনবাদের জনক বলা হয়। ১৯৫৩ সালে ডেভিড ইস্টনের 'Political System-an Enquiry into the State of Political Science' প্রকাশিত হলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনার এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। তিনি 'Input-Output' বিশ্লেষনের মাধ্যমে রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে সম্পুর্নরুপে বিজ্ঞান হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেন।

আচরনবাদের বৈশিষ্ঠ্য:-

ডেভিড ইস্টন আচরনবাদের ৮টি বৈশিষ্ঠ্যের উল্লেখ করেছেন। এগুলি হল -

১) নিয়মমাফিকতা ২) সত্যতা প্রমান
২) কৌশল উদ্ভাবন ৩) সংখ্যায়ন
৪) মুল্যবোধ নিরপেক্ষতা ৫) নিয়মাবদ্ধ সুস্মন্ধকরন
৭) বিশুদ্ধ বিজ্ঞান ৮) সংহতিসাধন

ই.এম.কার্কপেট্রিক আচরনবাদের চারটি বৈশিষ্ঠ্যের উল্লেখ করেছেন-

১) আচরনবাদ মানুষের রাজনৈতিক আচরনকেই বিশ্লেষনের মুখ্য বিষয় হিসাবে গ্রহন করে।
২) আচরনবাদ অন্যান্য সমাজ বিজ্ঞানের সাথে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ঐক্য সাধনের উপর গুরুত্ব আরোপ করে।
৩) আচরনবাদ পরিসংখ্যান ও তথ্য পরীক্ষা, শ্রেনী বিভাজন এবং পরিমাপের জন্য কৌশল অবলম্বন করে।
৪) আচরনবাদ সুসংবদ্ধ এবং অভিজ্ঞতাবাদী তত্ব গঠনে উদ্যোগ গ্রহন করে।

ইউলাও, এল্ডারভেল্ড এবং জ্যানোউটজ্ আচরনবাদের চারটি বৈশিষ্ঠ্যের উল্লেখ করেছেন-

১) আচরনবাদ ঘটনা, কাঠামো, প্রতিষ্ঠান অথবা মতাদর্শের পরিবর্তে ব্যাক্তির আচরনকে তাত্ত্বিক এবং অভিজ্ঞতাবাদী বিশ্লেষনের বিষয় রুপে গ্রহন করে।
২) আন্ত:সমাজবিজ্ঞানমুখী আলোচনা করে।
৩) তত্ত্ব ও গবেষনার পারস্পরিক নির্ভরশীলতার উপর গুরুত্ব আরোপ করে।
৪) রাজনৈতিক আচরনের সমস্যার ক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষন পদ্ধতি প্রয়োগ করে।

উপরোক্ত বিভিন্ন আচরনবাদীদের মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আচরনবাদের সাধারন বৈশিষ্ঠ্য গুলিকে এভাবে

তুলে ধরা যেতে পারে-

১) আচরনবাদ আলোচনাকে মূল্যমান নিরপেক্ষ রাখতে চায়।

২) আচরনবাদ অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞান সমূহের সাথে ঘনিষ্ঠ্য সম্পর্ক স্থাপনের উপর জোর দেয়।

৩) আচরনবাদ তত্ত্ব ও গবেষনার পারস্পরিক নির্ভরশীলতার উপর গুরুত্ব আরোপ করে।

৪) আচরনবাদ রাজনৈতিক আচরন পর্যালোচনার ক্ষেত্রে ভৌত বিজ্ঞানের ন্যায় নিয়মানুবর্তিতা, সংখ্যায়ন, ধারনার সুসংহতকরন, সংহতিসাধন প্রভৃতির উপর জোর দেয়।

৫) আচরনবাদ কাঠামো, প্রতিষ্ঠান, মতাদর্শ, প্রভৃতির পরিবর্তে ব্যাক্তির আলোচনার উপর গুরুত্ব আরোপ করে।

সমালোচনা:-

১) আচরনবাদ রক্ষনশীল মতবাদ। প্রচলিত বর্জোয়া সমাজকে কি ভাবে টিকিয়ে রাখা যায় তারই উপায় নির্ধারনে ব্যাস্ত আচরনবাদ। সমাজ পরিবর্তনের জন্য আচরনবাদ কোন উৎসাহ দেখায়নি।

২) আচরনবাদ পদ্ধতি, তথ্য ও পরিসংখ্যান সংগ্রহের উপর অত্যাধিক সময় ব্যায় করেছে। কিন্তু মানুষের জটিল রাজনৈতিক আচরনের নিখুঁত তথ্য ও পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা সম্ভব নয়।

৩) আচরনবাদ মুল্যবোধকে অগ্রাহ্য করেছে যা ভ্রান্ত বলে পরিগনিত হয়েছে। এজন্য আচরনবাদোত্তর বিপ্লবের উদ্ভব হয়েছে। যেখানে মুল্যবোধকে পুনরায় গুরুত্ব দিতে বাধ্য হয়েছে।

৪) আচরনবাদ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের স্বাতন্ত্র্যতাকে ক্ষুন্ন করেছে।

৫) আচরনবাদ যে রাষ্ট্রহীন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ধারনা প্রচার করেছে তা পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের ভয়াবহ রুপ আড়ালের জন্যই।

উপরোক্ত সমালোচনাগুলি থাকা সত্ত্বেও বলা যায় যে, আচরনবাদ চিরাচরিত রাজনৈতিক আলোচনার পথ অতিক্রম করে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনায় যে নতূন পদ্ধতির অবতারনা করেছে এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিজ্ঞান শব্দটিকে জোরালো ভাবে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছে তার গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না।

প্রশ্ন:- আচরনবাদের মৌল বৈশিষ্ট্যগুলি উললেখ কর।

উত্তর:-আচরনবাদ হল ''প্রতিবাদ'' এবং ''বৌদ্ধিক ও শিক্ষাগত আন্দোলন''বিশেষ। মানুষ ও তার আচরনের উপর গুরুত্ব আরোপ করে আচরনবাদ। রাজনৈতিক জগতে মানুষের জটিল প্রকৃতির আচরন বিশ্লেষণ করার জন্য তথ্য ও পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা এবং সংগৃহিত তথ্য ও পরিসংখ্যানের উপর অভিজ্ঞতাবাদী তত্ত্ব গড়ে তোলার লক্ষ্যই হল আচরনবাদ।

ডেভিড ইস্টন, কার্কপেট্রিক, ইউলাও, এল্ডারভেল্ড, জেনোউইট্জ্ প্রমুখ আচরনবাদীরা আচরনবাদের কিছু মৌল বৈশিষ্টের কথা উল্লেখ করেছেন। ডেভিড ইস্টন আচরনবাদের আটটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্টের উল্লেখ করেছেন। এগুলি হল - ১) নিয়মমাফিকতা, ২) সত্যতাপ্রমান, ৩) কৌশল উদ্ভাবন, ৪) সংখ্যায়ন, ৫) মুল্যবোধ নিরপেক্ষতা, ৬) নিয়মাবদ্ধ সুসম্বন্ধকরন, ৭) বিশুদ্ধ বিজ্ঞান, ৮) সংহতি সাধন।

আচরনবাদের মৌল বৈশিষ্ট্যগুলিকে এভাবে তুলে ধরা যেতে পারে-

১) আচরনবাদ আলোচনাকে মুল্যবোধ নিরপেক্ষ রাখতে চাই।
২) আচরনবাদ অন্যান্য সমাজ বিজ্ঞান সমূহের সাথে ঘনিষ্ঠ্য সম্পর্ক স্থাপনের উপর জোর দেয়।
৩) আচরনবাদ তত্ত্ব ও গবেষনার পারস্পরিক নির্ভরশীলতার উপর গুরুত্ব আরোপ করে।
৪) আচরনবাদ রাজনৈতিক আচরন পর্যালোচনার ক্ষেত্রে ভৌতবিজ্ঞানের ন্যায় নিয়মানুবর্তিতা, সংখ্যায়ন, ধারনার সু-সংহতকরন, সংহতিসাধন প্রভৃতির উপর জোর দেয়।
৫) আচরনবাদ কাঠামো, প্রতিষ্ঠান, মতাদর্শ প্রভৃতির পরিবর্তে ব্যাক্তির আলোচনার উপর গুরুত্ব আরোপ করে।
৬) আচরনবাদ সুসম্বন্ধ এবং অভিজ্ঞতাবাদী তত্ব গঠনে উদ্যোগ গ্রহন করে।

প্রশ্ন:- আচরনবাদের মৌল বৈশিষ্ট্যগুলি উললেখ কর।

উত্তর:-আচরনবাদ হল ''প্রতিবাদ'' এবং ''বৌদ্ধিক ও শিক্ষাগত আন্দোলন''বিশেষ। মানুষ ও তার আচরনের উপর গুরুত্ব আরোপ করে আচরনবাদ। রাজনৈতিক জগতে মানুষের জটিল প্রকৃতির আচরন বিশ্লেষণ করার জন্য তথ্য ও পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা এবং সংগৃহিত তথ্য ও পরিসংখ্যানের উপর অভিজ্ঞতাবাদী তত্ত্ব গড়ে তোলার লক্ষ্যই হল আচরনবাদ।

ডেভিড ইস্টন, কার্কপেট্রিক, ইউলাও, এল্ডারভেল্ড, জেনোউইট্জ্ প্রমুখ আচরনবাদীরা আচরনবাদের কিছু মৌল বৈশিষ্টের কথা উল্লেখ করেছেন। ডেভিড ইস্টন আচরনবাদের আটটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্টের উল্লেখ করেছেন। এগুলি হল - ১) নিয়মমাফিকতা, ২) সত্যতাপ্রমান, ৩) কৌশল উদ্ভাবন, ৪) সংখ্যায়ন, ৫) মুল্যবোধ নিরপেক্ষতা, ৬) নিয়মাবদ্ধ সুসম্বন্ধকরন, ৭) বিশুদ্ধ বিজ্ঞান, ৮) সংহতি সাধন।

আচরনবাদের মৌল বৈশিষ্ট্যগুলিকে এভাবে তুলে ধরা যেতে পারে-

১) আচরনবাদ আলোচনাকে মুল্যবোধ নিরপেক্ষ রাখতে চাই।
২) আচরনবাদ অন্যান্য সমাজ বিজ্ঞান সমূহের সাথে ঘনিষ্ঠ্য সম্পর্ক স্থাপনের উপর জোর দেয়।
৩) আচরনবাদ তত্ত্ব ও গবেষনার পারস্পরিক নির্ভরশীলতার উপর গুরুত্ব আরোপ করে।
৪) আচরনবাদ রাজনৈতিক আচরন পর্যালোচনার ক্ষেত্রে ভৌতবিজ্ঞানের ন্যায় নিয়মানুবর্তিতা, সংখ্যায়ন, ধারনার সু-সংহতকরন, সংহতিসাধন প্রভৃতির উপর জোর দেয়।
৫) আচরনবাদ কাঠামো, প্রতিষ্ঠান, মতাদর্শ প্রভৃতির পরিবর্তে ব্যাক্তির আলোচনার উপর গুরুত্ব আরোপ করে।
৬) আচরনবাদ সুসম্বন্ধ এবং অভিজ্ঞতাবাদী তত্ব গঠনে উদ্যোগ গ্রহন করে।

প্রশ্ন:- আচরনবাদের সীমাবদ্ধতাগুলি উল্লেখ কর।

উত্তর:-রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনায় সাবেকী দৃষ্টিভঙ্গীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরুপ জন্মনেয় আচরনবাদ। প্রকৃতিক বিজ্ঞানের কলা কৌশল ব্যবহার করে রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে যে বিজ্ঞান হিসাবে পর্যবসিত করা যায় তা প্রমান করার চেষ্টা করে আচরনবাদ। এক্ষেত্রে আচরনবাদ এক সর্বাধুনিক এবং গুরুত্বপুর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী। আচরনবাদ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনায়েক নতূন পদ্ধতির অবতারনা করলেও এই দৃষ্টিভঙ্গীকে বিভিন্ন দিক দিয়ে সমালোচনা করা হয়েছে। আচরনবাদের প্রধান প্রধান সীমাবদ্ধতা গুলি হল নিম্নরুপ-

১) আচরনবাদ রক্ষনশীল। প্রচলিত বুর্জোয়া সমাজকে কি ভাবে টিকিয়ে রাখা যায় তারি উপাউ নির্ধারনে ব্যাস্ত আচরনবাদ। সমাজ পরিবর্তনের জন্য আচরনবাদ কোন উৎসাহ দেখায়নি।

২) আচরনবাদ পদ্ধতি, তথ্য ও পরিসংখ্যান সংগ্রহের উপর অত্যাধিক সময় ব্যায় করেছে। কিন্তু মানুষের জটিল রাজনৈতিক আচরনের নিঁখুত তথ্য ও পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা সম্ভব নয়।

৩) আচরনবাদ মূল্যবোধকে অগ্রহ্য করেছে। যা ভ্রানত বলে পরিগনিত হয়েছে। এজন্য আচরনবাদোত্তর বিপ্লবের উদ্ভব হয়েছে, যেখানে মুল্যবোধকে পুনরায় গুরুত্ব দিতে বাধ্য হয়েছে।

৪) আচরনবাদ অন্যান্য সমাজ বিজ্ঞানের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের স্বাতন্ত্র্যতাকে ক্ষুন্ন করেছে।

৫) আচরনবাদ যে রাষ্ট্রহীন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ধারনা প্রচার করেছে তা পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের ভয়াবহ রুপ আড়ালের জন্যই।

৬) মার্কস্ বাদীদের মতে, আচরনবাদ শুধু মানুষের রাজনৈতিক আচরনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে এবং মানুষের আর্থ-সামাজিক দিকটিকে উপেক্ষা করেছে। কিন্তু মানুষের রাজনৈতিক আচরন সমাজের উপরিকাঠামো মাত্র। যা নিয়ন্ত্রিত হয় সমাজের ভিত্তি তথা অর্থনৈতিক ব্যবথার বা উৎপাদন পদ্ধতির দ্বারা।

প্রশ্ন:- আচরনবাদের সীমাবদ্ধতাগুলি উল্লেখ কর।

উত্তর:-রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনায় সাবেকী দৃষ্টিভঙ্গীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরুপ জন্মনেয় আচরনবাদ। প্রকৃতিক বিজ্ঞানের কলা কৌশল ব্যবহার করে রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে যে বিজ্ঞান হিসাবে পর্যবসিত করা যায় তা প্রমান করার চেষ্টা করে আচরনবাদ। এক্ষেত্রে আচরনবাদ এক সর্বাধুনিক এবং গুরুত্বপুর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী। আচরনবাদ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনায়েক নতূন পদ্ধতির অবতারনা করলেও এই দৃষ্টিভঙ্গীকে বিভিন্ন দিক দিয়ে সমালোচনা করা হয়েছে। আচরনবাদের প্রধান প্রধান সীমাবদ্ধতা গুলি হল নিম্নরুপ-

১) আচরনবাদ রক্ষনশীল। প্রচলিত বুর্জোয়া সমাজকে কি ভাবে টিকিয়ে রাখা যায় তারি উপাউ নির্ধারনে ব্যাস্ত আচরনবাদ। সমাজ পরিবর্তনের জন্য আচরনবাদ কোন উৎসাহ দেখায়নি।

২) আচরনবাদ পদ্ধতি, তথ্য ও পরিসংখ্যান সংগ্রহের উপর অত্যাধিক সময় ব্যায় করেছে। কিন্তু মানুষের জটিল রাজনৈতিক আচরনের নিঁখুত তথ্য ও পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা সম্ভব নয়।

৩) আচরনবাদ মূল্যবোধকে অগ্রহ্য করেছে। যা ভ্রানত বলে পরিগনিত হয়েছে। এজন্য আচরনবাদোত্তর বিপ্লবের উদ্ভব হয়েছে, যেখানে মুল্যবোধকে পুনরায় গুরুত্ব দিতে বাধ্য হয়েছে।

৪) আচরনবাদ অন্যান্য সমাজ বিজ্ঞানের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের স্বাতন্ত্র্যতাকে ক্ষুন্ন করেছে।

৫) আচরনবাদ যে রাষ্ট্রহীন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ধারনা প্রচার করেছে তা পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের ভয়াবহ রুপ আড়ালের জন্যই।

৬) মার্কস্ বাদীদের মতে, আচরনবাদ শুধু মানুষের রাজনৈতিক আচরনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে এবং মানুষের আর্থ-সামাজিক দিকটিকে উপেক্ষা করেছে। কিন্তু মানুষের রাজনৈতিক আচরন সমাজের উপরিকাঠামো মাত্র। যা নিয়ন্ত্রিত হয় সমাজের ভিত্তি তথা অর্থনৈতিক ব্যবথার বা উৎপাদন পদ্ধতির দ্বারা।

প্রশ্ন : একটি স্বাধীন শাস্ত্র হিসাবে জন প্রশাসনের বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়গুলি বিশ্লেষণ কর ।

উত্তর : আধুনিক জন প্রশাসনের ক্রমবিকাশ একদিনে হয়নি । এর পেছনে আছে দীর্ঘদিনের ইতিহাস। জন প্রশাসনবিদগন জন প্রশাসনের বিবর্তনের ইটিহাসকে কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করেছেন । পর্যায়গুলি যে পরস্পরের থেকে স্বতন্ত্র তা নয় । তবে বিবর্তনের এক একটি স্তর বিশেষভাবে বৈশিষ্ট্য পূর্ণ । জন প্রশাসনের বিবর্তনের বিভিন্ন স্তরগুলি নিম্নরুপ :-

প্রথম স্তর : প্রথম স্তরের কাল পর্ব হল ১৮৮৭ সাল থেকে ১৯২৬ সাল পর্যন্ত । এই সময়টি হল জনপ্রশাসন শাস্ত্রটিকে একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র হিসাবে প্রতিষ্ঠার সময় । এক্ষেত্রে পথিকৃত হলেন ভূতপূর্ব মার্কীন রাষ্ট্রপতি এবং প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের **অধ্যাপক উড্রো উইলসন** । **১৮৮৭** সালে প্রকাশিত তাঁর **The Study of Administration** গ্রন্থে উইলসন প্রথম রাজনীতি থেকে জনপ্রশাসনকে পৃথক করার কথা বলেন । তিনিই প্রথম তাঁর গ্রন্থে দাবী রাখলেন যে রাজনৈতিক কার্যকলাপ ও প্রশাসনিক কার্যকলাপ কখনই সমাথ্রক হতে পারে না । এ দুটি পরপস্পর বিরোধী ধারনা । আর এ জন্যই জনপ্রশাসনকে একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজনীয়তা আছে । উইলসনের এই ধারনাটিকে আরো প্রসারিত করেন **গুডনাও (Good Now)** তাঁর **Politics and Asministration** গ্রন্থে । যা ১৯০০ সালে প্রকাশিত হয় । এই গ্রন্থে তিনি মন্তব্য করেন যে প্রশাসন রাজনীতি থেকে আলাদা এবং রাজনীতির প্রয়োজনেই প্রশাসনকে আলাদা করা প্রয়োজন । এরপর ১৯২৬ সালে প্রকাশিত **Intriduction to the Study of Administration** গ্রন্থে হোয়াইট এই দাবিকে আরো জোরদার করেন ।

দ্বিতীয় স্তর : দ্বতীয় স্তরের কালপর্ব হল ১৯২৭ সাল থেকে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত । এই স্তরটিকে বৈজ্ঞানিক পরিচালন ব্যবস্থা **(Scientific Management)** - র স্তর বলা হয় । এই স্তরে প্রশাসনকে মুল্যনিরপেক্ষ করে গড়ে তোলার প্রয়াস পরিলক্ষিত হয় । এবং জনপ্রশাসনকে কতগুলি সুনির্দিষ্ট নীতি বা মূল সূত্রের উপর উপস্থাপন করার চেষ্টা করা হয় । এ বিষয়ে অগ্রনী ভূমিকা পালন করেন ফ্রেডরিখ টেলর । তিনি তাঁর **The Principles of Scientific Management** মন্তব্য করেন যে সময় জ্ঞান, কর্তব্য নিষ্ঠা এবং পরিশ্রমই হল অধিক ইৎপাদন এবং অধিক উপার্জনের একমাত্র পথ । কিভাবে বেশি শ্রম নিয়োগ করে বেশি উৎপাদন করা যায় তা অনুসন্ধান
করেছেন টেলর । নতুন কর্মপদ্ধতি স্থির করা ও শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধি করাই পরিচালন ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত বলে তিনি মনে করেন । সংক্ষেপে বলতে গেলে টেলরের বৈজ্ঞানিক পরিচালন ব্যবস্থায় শ্রমিককে যন্ত্রের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে এবং মানবিক দিকটি উপেক্ষিত হয়েছে ।

উল্লেখযোগ্য যে **১৯২৭** সালে প্রকাশিত **উইলোবির Principle of Public Administration** গ্রন্থের মধ্য দিয়ে এই পর্বের সূচনা হয় ।টেলর বৈজ্ঞানিক পরিচালনার বিস্তৃত ব্যাখ্যা দেন এবং মুনের **Principle of Organisation** গ্রন্থটি বৈজ্ঞানিক পরিচালনা ধারনার প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করে । **১৯৩৭** সালে **লুথার গালিক** এবং **লিন্ডাল আরউইকের** প্রবন্ধ **Paper on the Science of Administration** প্রকাশিত হয় । এ যুগের শ্রষ্ঠ্য আবদান হিসাবে এটিকে চিহ্নিত করা হয় । লুথার গালিকের **POSDCORB** পদ্ধতি জনপ্রশাসন শাস্ত্রের বিষয়বস্তু নির্মানে এক মুল্যবান আবিষ্কার ।

তৃতীয় স্তর : তৃতীয় স্তরের সময় সীমা হল **১৯৩৮** সাল থেকে **১৯৪৭** সাল পর্যন্ত । দ্বীতিয় স্তরে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনায় শ্রমিকের মানবিক দিকটিকে বাতিল করে যান্ত্রিক দিকটিকে প্রতিষ্ঠা করা হয় । তৃতীয় স্তরের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল যে এখানে যান্ত্রিক দিকটিকে পরিহার করে মানবিক দিকটিকে প্রতিষ্ঠা করা হয় । এই তৃতীয় স্তরটিকে মানবিক সম্পর্ক **(Human Relations)** আন্দোলন রুপে বর্ণনা করা হয় । বার্নাড, সাইমন, ডাল প্রমুখ মানবিক সম্পর্ক গোষ্ঠীর প্রবক্তারা বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা মতবাদটিকে বাতিল করে দেয়ন এবং মানুষ যে যন্ত্র নয় তা প্রমান করার চেষ্টা করেন ।

এলটন মেয়ো এবং তাঁর সঙ্গীরা ১৯২৭ সাল থেকে ১৯৩২ সাল পর্যন্ত **Harvard Business School** এর পক্ষ থেকে **Western Electeic Company -** র **Hawthorn** কারখানায় অনুসন্ধান চালান । তাঁরা লক্ষ্য করেন যে বৈজ্ঞানিক নীতির চেয়ে পারিপার্শিক পরিস্থিতি, মনস্ততত্ব ও সামাজিক অবস্থা কর্মীদের কাজকে প্রভাবিত করে । শ্রমীকদের আর্থিক সুবিধাদানের প্রলোভন দেখিয়ে কাজে উৎসাহিত করা যায় না । শ্রমীকদের জন্য যথেষ্ট আলো, যাতায়াতের সুবিধা, বসবাসের সুবিধা, স্বাস্থ্য। শিক্ষা ও মনোরঞ্জনের যথেষ্ট ব্যবস্থা থাকলে শ্রমীকদের মধ্যে উৎপাদনী ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় । সংগঠনের পরিচালনা ব্যাবস্থার ক্ষেত্রে হওথর্ন কারখানার অনুসন্ধান এক বিপ্লব নিয়ে আসে ।

চতুর্থ স্তর : এই স্তরের কাল পর্ব হল ১৯৪৮-১৯৭০ সাল পর্যন্ত । চতুর্থ স্তরে গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় হল **সাইমনের Administrative Behaviour** এবং **রবার্ট ডালের The Science of Public Administration** গ্রন্থ দুটি । এই স্তরগুলি পূর্বসূরীদের যাবতীয় চিন্তাধারাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বসে এবং জনপ্রশাসনের চিন্তাজগতে আলোড়ন তোলে । সাইমন যে তত্ত্বটি হাজির করেন সেটি **Alternative Behaviour Model** নামে খ্যাত । সাইমনের এই মডেল অনুসারে সংগঠনের শীর্ষস্থানীয় প্রশাসকদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল সিদ্ধান্ত গ্রহন । সাইমনের মডেলটি আচরনবাদের উপর গড়ে উঠেছে । কেননা প্রশাসকদের আচরন বা দৃষ্টিভঙ্গী প্রশাসনের চরিত্র এবং সংগঠনের উৎকর্ষের মুখ্য নিয়ামক । সাইমনের মতোই রবার্ট ডাল মনস্ততব ও সামাজিক মনস্তত্ব কে জনপ্রশাসনের আলোচনার ভিত্তি হিসাবে গড়ে তুলতে চেয়েছেন ।

পঞ্চম স্তর : পঞ্চম স্তর ১৯৭১ সালের পর থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত সময় কালকে অন্তর্ভূক্ত করে । দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর জনপ্রশাসনের ক্ষেত্রে এক যুগান্তরকারী পরিবর্তন আসে । **নাইগ্রো এবং নাইগ্রো** বলেছেন **"After the World War-II the whole concept of Public Administration exapanded."** বৈজ্ঞানিক পরিচালন এবং অন্যান্য ধারনা পরিত্যাক্ত হয়নি । কিন্তু এই অনুভূতি দেখা দিল যে কেবল বৈজ্ঞানিক পরিচালন এবং দ্বি-বিভাজন দিয়ে জনপ্রশাসনের আলোচনা করা যাবে না । সিদ্ধান্ত গ্রহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পর্কিত আলোচনাকে জনপ্রশাসনের অন্তর্ভূক্ত করা প্রয়োজন । জনপ্রশাসনকে অন্যান্য সমাজবিজ্ঞানের সাথে সম্পর্ক যুক্ত করার ফলে জনপ্রশাসনের যে অস্তিত্বের সংকট **(Crisis of Identity)** দেখা দেয় তা থেকে জনপ্রশাসন বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয় এবং অন্যান সমাজবিজ্ঞানের সাথে সম্পর্ক যুক্ত হয়েও জনপ্রশাসনের স্বতন্ত্র স্বত্ত্বা বজায় রাখতে কোনো অসুবিধা হয়নি । জনপশাসনের এই গৌরবময় উত্থানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে **American Society for Public Administration** -এর সহযোগী সংস্থা **National Academy of Public Administration .** এই অ্যাকাডেমির উদ্দেশ্যই ছিল বিভিন্ন শাস্ত্র থেকে মেধাবী গবেষক ও প্রশাসকদের অ্যাকাডেমির প্রতি আকৃষ্ট করা এবং পারস্পরিক ভাব বিনিময়ের মাধ্যমে প্রশাসনের উৎকর্ষ সাধন করা । অ্যাকাডেমি তার উদ্দেশ্য সাধনে অনেকটাই সফল হয়েছে । প্রকৃত সত্য উদঘাটনে জনপ্রশাসন আজ প্রশাসন বিজ্ঞান, ব্যবস্থাপনা বিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব, সমাজবিদ্যা, অর্থবিদ্যা, আইনশাস্ত্র প্রভৃতি সমস্ত সমাজবিজ্ঞানের সাহায্য গ্রহনে উৎসুক। বর্তমানে জনকল্যানকর রাষ্ট্রে রাষ্ট্রের প্রশাসনিক কার্যকলাপ যতই বৃদ্ধি পাচ্ছে জনপ্রশাসন শাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তাও তত বৃদ্ধি পাচ্ছে ।

প্রশ্ন : ভারত কি একটি যুক্তরাষ্ট্র ? --তোমার উত্তরের সবপক্ষে যুক্তি দাও ।

অথবা

ভারতের যুক্তরাষ্টীয় প্রকৃতি বর্ণণা কর ।

উত্তর : ভারতীয় সংবিধান যুক্তরাষ্ট্রীয় না এককেন্দ্রীক এটি একটি অত্যন্ত বিতর্কিত বিষয় । উল্লেখযোগ্য যে ভারতীয় সংবিধানে কোথাও 'যুক্তরাষ্ট্র' কথাটি উল্লেখ করা হয়নি । সংবিধানের ১(১) নং ধারায় বলা হয়েছে , ''India, that is Bharat, shall be a Union of States''। অর্থাৎ 'যুক্তরাষ্ট্র'কথাটির পরিবর্তে 'রাজ্য সমূহের সংঘ' কথাগুলি ব্যবহার করা হয়েছে । এর স্বপক্ষে ড. অম্বেদকর সংবিধান সভায় দুটি যুক্তির অবতারনা করেছিলেন -

১) ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র রাজ্যগুলির চুক্তির ফলে সৃষ্টি হয়নি ।
২) ভারতীয় সংবিধানে রাজ্যগুলিকে পৃথক হবার অধিকার প্রদান করা হয়নি ।

সংবিধানে যুক্তরাষ্ট্র কথাটি না থাকলেও যুক্তরাষ্ট্রের সাধারন বৈশিষ্ট্যগুলি ভারতে বিদ্যমান । যেমন -

১) কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের উপস্থিতি,
২) দু'প্রকার সরকারের মধ্যে ক্ষমতক্ষর বিভাজন,
৩) সংবিধানের প্রাধান্য,
৪) লিখিত ও দুস্পরিবর্তনীয় সংবিধান,
৫) নিরপেক্ষ যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত হিসাবে সুপ্রীম কোর্টের উপস্থিতি,
৬) দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা - লোকসভা ও রাজ্যসভা প্রভৃতি ।

যেহেতু প্রশাসনিক, আইনগত প্রভৃতি ক্ষেত্রে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার সম্পূর্ণ স্বাধীন ইচ্ছানুযায়ী কাজ করে সেহেতু নিজ নিজ ক্ষেত্রে কেও কারোও পরাধীন নয় বরং একে অপরের সহযোগী । এছাড়া ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে সহযোগীতার উপর জোর দেওয়া হয়েছে । যেমন - রাজ্যপালদের সম্মেলন, মুখ্যমন্ত্রীদের সম্মেলন, আন্তঃরাজ্য পরিষদ, আঞ্চলিক পরিষদ প্রভৃতির কথা বলা যায় । একারনে মরিস জোন্স, গ্রানভিল অস্টিন প্রমুখেরা ভারতকে একটি 'সমবায়িক যুক্তরাষ্ট্র' বলে অভিহিত করেছেন ।

তবে বাস্তবে যদি আমরা দেখি তাহলে দেখব যে আইন, শাসন এবং আর্থিক - এই তিন দিক দিয়েই কেন্দ্রীয় প্রাধান্য অত্যন্ত বেশি । যেমন -

আইনগত দিক দিয়ে :

১) কেন্দ্রীয় তালিকায় আছে ১০০টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । সেখানে রাজ্য তালিকায় আছে ৬১টি বিষয় । তাছাড়া যৌথ তালিকার ক্ষেত্রে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারে মধ্যে বিরোধ বাঁধলে কেন্দ্রীয় আইনই প্রাধান্য পায় । আবার অবশিষ্ট বিষয়গুলি উপর আইন প্রনয়নের ক্ষমতা কেন্দ্রকে দেওয়া হয়েছে ।
২) রাজ্যসভায় উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যের দুই তৃতীয়াংশের ভোটে প্রস্তাব গৃহিত হলে জাতীয় স্বার্থে রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়ের উপরোও পার্লামেন্ট আইন প্রণয়ন করতে পারে ।২৪৯ নং ধারা ।
৩) জাতীয় জরুরী অবস্থা জারী থাকলে পার্লামেন্ট সমগ্র ভারতের জন্য বা তার যে কোন অংশের জন্য রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়ের উপর আইন প্রণয়ন করতে পারে । ২৫০ নং ধারা ।
৪) আন্তর্জাতিক সন্ধি বা চুক্তিকে বলবৎ করার জন্য প্রয়োজন হলে পার্লামেন্ট রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়ের উপর আইন প্রণয়ন করতে পারে । ২৫৩ নং ধারা ।

শাসনগত দিক দিয়ে :

১) সংবিধানের ৩৫২ নং ধারা অনুসারে জাতীয় জরুরী অবস্থা এবং ৩৫৬ নং ধারা অনুসারে রাজ্যে শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা জনিত জরুরী অবস্থা ঘোষনার দ্বারা কেন্দ্রীয় সরকার অঙ্গরাজ্যের শাসনভার নিজের হাতে নিতে পারে ।

২) ৩ নং ধারা অনুসারে কেন্দ্র রাজ্যগুলির সম্মতি ছাড়াই রাজ্যের সীমানা, নাম পরিবর্তন করতে পারে ।

৩) রাজ্যপাল কেন্দ্রীয় সরকারের স্বার্থবাহী এজেন্ট হিসাবে কাজ করে ।

৪) শাসনকার্য্য পরিচালনার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকাগুলিকে পার্লামেন্ট প্রণীত আইনের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলতে হয় ।

অর্থনৈতিক দিক দিয়ে :

১) ৩৬০ নং ধারা অনুসারে আর্থিক জরুরি অবস্থা জারী হলে রাজ্যগুলিকে কেন্দ্রের নির্দেশ মতো আর্থিক নীতি গ্রহন করতে হয় ।

২) অধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করগুলি কেন্দ্রের অধীন ।

৩) রাজ্য সরকারগুলি আয়-ব্যায় লেন-দেন পরীক্ষার জন্য হিসাব রক্ষক এবং ব্যায় নিয়ন্ত্রক ও মহা হিসাব পরিক্ষক রয়েছেন যাঁরা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন ।

৪) কেন্দীয় অনুদানের মাধ্যমেও কেন্দ্র রাজ্যগুলিকে নিয়ন্ত্রন করে ।

তাছাড়া আরো কতগুলি বিশেষ ব্যবস্থা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যাবস্থায় অনুপস্থিত। যেমন - উচ্চ কক্ষের সমপ্রতিনিধিত্বের নীতি অনসৃত হয়নি । দ্বৈত নাগরিকতা, দ্বৈত বিচার ব্যাবস্থা, দ্বৈত শাসন ব্যাবস্থাকে স্বীকার করা হয়নি ।

ভারতীয় যূক্তরাষ্ট্রীয় ব্যাবস্থায় কেন্দ্রিকতার প্রতি ঝোঁক আত্যন্ত বেশি হওয়ায় ক.সি.হোয়্যার ভারতকে একটি ‘আধা-যুক্তরাষ্ট্র’ বলে বর্ণনা করেছেন । অধ্যাপক দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতকে কেন্দ্রিকতার প্রতি অত্যধিক ঝোঁক বিশিষ্ট যুক্তরাষ্ট্র বলে বর্ণনা করেছেন । পরিশেষে সংবিধান বিশারদ দুর্গাদাস বসুর মন্তব্যটিকে উল্লেখ করে এই বিতর্কের ইতি টানতে পারি - ‘‘Constitution of India is neither purely federal, nor purely Unitary but the combination of both .’’

প্রশ্ন : নারী আন্দোলনের বিভিন্ন ধারাগুলি আলোচনা কর ।

উত্তর : উনিশ শতকের সত্তরের দশক থেকে বিশ্বব্যাপী নারীবাদী আন্দোলনের যে ধারা প্রবাহিত হয়েছে সেগুলি নিম্নে আলোচনা করা হল --

১ **উদারনৈতিক নারীবাদ** : উদারনৈতিক নারীবাদী আন্দোলনের ভিত্তি হল সাবেকি উদারনৈতিক দর্শণ । এটি নারীবাদী আন্দোলনের প্রথম পর্ব । সাবেকি উদারনৈতিকদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এই পর্বের আন্দোলনকারীরা নারী পুরুষের সমান অধিকার দাবী করতেন । তাদের উত্থাপিত দাবির মধ্যে ছিল নারীর ভোটাধীকার, রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় যুকত হওয়ার অধিকার, শিক্ষার অধিকার, আইনি অধিকার প্রভৃতি ।

২) **মার্কসীয় নারীবাদ** : মার্কসীয় নারীবাদের তাত্ত্বিক ভিত্তি হল মার্কসবাদ । মার্কসীয় নারীবাদ আনুসারে লিঙ্গ বৈষম্যের বিষয়টি হল সামগ্রিক শোষণ ব্যবস্থার একটি অঙ্গ। এই মতবাদ অনুসারে সমাজে নারীদের আসম আবস্থানের প্রধান কারন হল অর্থনৈতিক । সুতরাং নারীকে একটি শ্রেণী হিসাবে উপস্থাপন করা হয়েছে । নারীদের উৎপাদন ব্যবসথায় অংশগ্রহনের মাধ্যমে লিঙ্গ বৈষম্যের অবসান ঘটতে পারে ।

৩) **সমাজতান্ত্রিক নারীবাদ** : সমাজতান্ত্রিক নারীবাদীরা মার্কসবাদের মূল সূত্রগুলিকে গ্রহন করেন । তবে তারা মনে করেন যে শুধুমাত্র ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভবের সাথে লিঙ্গ বৈষম্য সম্পর্কিত নয় । তাই ব্যক্তিগত স্মত্তির উচ্ছেদ ঘটলেই পিতৃতন্ত্রের অবসান ঘটবে একন ভাবা ঠিক নয় । এদের মধ্যে নারী শিষনের কেন্দ্রীয় উপাদান হল দুটি -একদিকে শিষিত জনগনের অঘশ হিসাবে এবং পরিবারে পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থার দ্বারা । সুতরাং নারীবাদী সংগঠনগুলিকে এমন সব কমড়সূচী গ্রহন করতে হবে যাতে একই সঙ্গে পুঁজিবাদ ও পিতৃতন্ত্রের অবসান ঘটে ।

৪) **র‍্যাডিক্যাল নারীবাদ** : র‍্যাডিক্যাল নারীবাদ উদারনৈতিক নারীবাদের মতো পিতৃতন্ত্রকে স্বাভাবিক ব্যবস্থা বলে মনে করে না । আবার মাকড়সবাদীদের মতো অথ্রনৈতিক শ্রেণী ভিত্তিক দ্বন্দকে সমাজে মূল দ্বন্দ বলে মনে করে না । এদের মতে সমাজে পুরুষের আধিপত্যর মূলে আছে জৈবিক এবং মনস্তাত্তিক কারন । এবং সমাজের মুল দ্বন্দটই হল লিঙ্গভিত্তিক দ্বন্দ । এই মতবাদ অনুসারে নারীকে তার অবস্থার উন্নতির জন্য সক্রিয় এবং বৈপ্লবিক ভূমিকা পালন করতে হবে ।

৫) **পরিবেশ সচেতন নারীবাদ** : পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে অনুষ্ঠিত পরিবেশ আন্দোলনের প্রভাবে এই দৃষ্টিভঙগীর উদ্ভব । এই মতবাদের অনুগামীরা নারী ও প্রকৃতির মধ্যে একটা সম্পকড় খুঁজে পান । এদের মতে এরা উভয়েই আধিপত্যের স্বীকার । নারীকে পুরুষতান্ত্রিক সামাজিক ব্যবস্থার অধীনে থাকতে হয় এবং শোষিত ও নির্যাতিত হতে হয় । বর্তমানে এই পরিবেশ সচেতন নারীবাদ জনপ্রীয় হয়ে উঠেছে । কারন এতে পরিবেশ সমস্যা ও নারী সমস্যা উভয়েই স্থান পেয়েছে ।

৬) **মানবতাবাদী নারীবাদ** : এই মতবাদে লিঙ্গ বৈষম্যের বিষয়টিকে মানবতার ভিত্তিতে বিচার করা হয় । এই মতবাদে পুরুষদের চেয়ে নারীদের কোন বাড়তি সুযোগ দেওয়ার বিরিধীতা করা হয় । এদের মতে সুযোগ দিতে হলে নারী ও পুরুষকে সমান সুযোগ দেওয়া উচিত । এরা মনে করেন সর্বজনীন অধিকার এখনও পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়নি । পৌর ও সামাজিক অধিকারের ক্ষেত্রে বৈষম্য এখনও রয়ে গেছে । এরা বিশ্বাস করেন পৌর, সামাজিক, রাজনীতিক প্রভৃতি অধিকারগুলি ভোগের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মধ্যে প্রকৃত সমানাধীকার প্রতিষ্ঠিত হলে লিঙ্গ-বষম্য অনেকটাই হ্রাস পাবে ।

৭) **নারী সমস্যা কেন্দ্রীক নারীবাদ** : মানবতাবাদী নারীবাদের মতো এদেরও বক্তব্য হল উদারনৈতিক কাঠামোই যখন নারী পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয় তখন শুধুমাত্র পুরুষদের কতা মাথায় রাখা হয় । ফলত নারীদের প্রতি অবহেলা করা হয় । এরা মনে করেন নারীদের প্রতি সুবিচার করতে হলে মাতৃত্বের অধিকার, বিষেষ নিরাপত্তার অধিকার প্রভৃতির ব্যবস্থা করা দরকার ।

৮) **বি-নির্মানবাদী নারীবাদ** : বি-নির্মানবাদী নারীবাদঈ নারীবাদীরাও নারীদের জন্য বিশেষ অধীকার দানের বিরোধী । এদের মতে এই বিষেষ অধিকার নারী ও পুরুষকে পৃথক স্বত্তা বিশিষ্ট গোষ্ঠিতে বিভক্ত করে

রাখবে । তাই এরা চান সমান পরিস্থিতিতে সমান অধিকার । অর্থাৎ বিশেষ পরিস্থিতিতে বিশেষ অধিকার চলতে পারে ।

৯) কৃষ্ণাঙ্গ নারীবাদ : নারীবাদী আলোচনায় জাতী ও বর্ণগত পার্থক্যকে উপেক্ষা করার একটি প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় । কৃষ্ণাঙ্গ নারীবাদ হল এই প্রবণতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ । সাবেকী নারীবাদি আলোচনায় সাধারনত: শ্বেতাঙ্গ মহিলাদেরই প্রধান্য দেওয়া হয়েছে । এবং তাদের অভিজ্ঞতাকেই তুলে ধরা হয়েছে । কৃষ্ণাঙ্গ মহিলদের অসুবিধা সমূহ এবং তাদের উপর আরোপিত অন্যায়-অবিচার সমূহ সম্পর্কে সাবেকী নারীবাদে আলোচনা করা হয়নি । একারনে কৃষ্ণাঙ্গ নারীবাদ এক নতুন ধরনের নারীবাদী আলোচনার সূত্রপাত ঘটিয়েছে । তাদের মতে জাতি ও বর্ণগত ভেদাভেদ নারীবাদী আলোচনায় অবশ্যই গুরুত্ব পাওয়া উচিত ।

প্রশ্ন : নারীবাদী তত্ত্বের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর ।

উত্তর: নারীবাদী তত্ত্বে একটি সম্পূর্ণ আলাদা দৃষ্টিকোন থেকে রাজনীতিকে বিচার বিশ্লেষণ করা হয়েছে । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী আলোচনার ক্ষেত্রে নারীবাদ একটি অন্যতম দৃষ্টিভঙ্গী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে । সুতরাং রাজনৈতিক তত্ত্বের পুন:রুত্থানের ক্ষেত্রেও নারীবাদ প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠে । নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গী প্রচলিত রাজনৈতিক চিন্তাধারাকে নস্যাৎ করে রাজনীতি ও সমাজকে নতূন ভাবে দেকার কতগুলি প্রবণতা গড়ে তোলে ।

নারীবাদী চিন্তাধারার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলিকে এভাবে তুলে ধরা যেতে পারে------

১) নারীবাদ হল এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গী যা লিঙ্গ বৈষম্য বা লিঙ্গ কর্তৃত্বের অবসান চায় । নারীবাদ সমাজে লিঙ্গগত বৈষম্য দূর করে সাম্য ভিত্তিক সমাজ গঠন করতে চাই । এরুপ সমাজে নারীরা সমান অধিকার ও সুযোগ সুবিধা ভোগ করবে ।

২) নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গী মুলত: একটি প্রতিবাদী আন্দোলন । এই আন্দোলন নারীকে হীনভাবে দেখে এমন দৃষ্টিভঙ্গী এবং প্রচলিত ভাষাকে বর্জন করার কথা বলে ।

৩) নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে যে রাজনীতি নারীর অস্তিত্ব ও ক্ষমতায়নের পরিধীকে বিকৃত ও সীমিত করে তার বিলোপ করা প্রয়োজন । পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীদের উপর পুরুষদের নানা রকম কর্তৃত্ব আরোপ, নির্যতন ও শোষণ আব্যাহত । নারীবাদ এসবের বিরুদ্ধে এক তাত্বিক বিশ্লেষণ । নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে সমাজে যেমন সামাজিক শ্রেণীভেদ, জাতীভেদ কিংবা বর্ণভেদ বিদ্যমান তেমনি লিঙ্গভেদও একটি বষম্যমুলক বিভাজন । এর দ্বারা নারীদের সামাজিক বিচ্চেদ ঘটানো হয়েছে ।

৪) নারীবাদী হল একটি মতাদর্শ যেখানে নারী সমাজের পরিবত্রনের ধারা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে । অর্থা শুধুমাত্র নারীদের অধিকার, সুযোগ-সুবিধা প্রদান সম্পর্কিত বিচার বিশ্লেষণী এই দৃষ্টিভঙ্গীতে আলোচিত হয় না । এই দৃষ্টিভঙ্গী চায় নারীদের সামাজিক বষম্যগুলিকেও পরিবর্তন করতে ।

৫) নারীবাদ মিসজিনি (misgny) - র সমালোচনা হিসাবে বিকশিত হয়েছে । মিসজিনি হল পুরুষের উৎকৃষ্টতা ও কেন্দ্রীয় অবস্থান বিষয়ক ধারনা । নারীদের মতে পুরুষের উৎকৃষ্টতার ধারনা হল পুরুষ তন্ত্রের সৃষ্টি । এই ধারনা জৈবিক পার্থক্যের উপর নির্ভশীল নয় । এই পার্থক্য সমাজ আরোপিত ।

৬) নারীবাদ রাজনীতি সম্বন্ধে এক নতুন ধারনা উপস্থিত করেছে । রাজনীতির এই নতূন তত্ত্ব লিঙ্গ-রাজনীতির তত্ত্ব । এটি রাজনীতি বিষয়ক এক নতূন দৃষ্টিভঙ্গী । রাজনীতি বিষয়ক মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে রাজনীতির বিষয়গুলিকে যেমন শ্রেণীগত দিক থেকে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হয়, তেমনি নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গীতে লিঙ্গ-রাজনীতির দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হয়

পরিশেষে বলা যায় যে, নারীবাদ মূল ধারার রাজনীতি চর্চার এক বিকল্প হিসাবে হাজির হয়েছে । নারীবাদ নতূন ধারনা ও তত্ত্ব সমূহ নির্মানের মাধ্যমে এক ভিন্নতর দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলার তেষ্টা করেছে ।